পরমা-প্রকৃতি

দুর্গা বসু



লেখক পরিচিতি



জন্ম ১৯৩৬-এ, কোলকাতায়। পিতা স্বর্গীয় সন্তোষকুমার বসু ছিলেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। স্কুল-কলেজের সব পরীক্ষাতেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ দুর্গাবাবু ১৯৫৯-এ শিবপুর থেকে প্রথম শ্রেণীর স্থপতি ডিগ্রী পান। কৈশোর থেকেই যুক্ত ছিলেন নানান ছাত্র ও যুব আন্দোলনে। '৫৬-'৫৭-তে ছিলেন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশান অব স্টুডেন্ট আর্কিটেক্টসের কনভেনার। '৫৭-'৫৮ বি. ই. কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি। ১৯৪৮ থেকে '৫৪ অবধি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এন. সি. সি.-র সাথে।

'৭২ সাল অবধি কোলকাতা ও দিল্লীর নানান আর্কিটেক্টস অফিসে দায়িত্বশীল পদে কাটিয়ে ১৯৭৩-এর পয়লা জানুয়ারী থেকে প্র্যাকটিশ করছেন 'দুর্গা বাসু অ্যাণ্ড অ্যাসোসিয়েটস' নামে। কোলকাতার বুকে অসংখ্য ছোট-বড় বাড়ীর মাঝে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর প্রতিভার ছাপ, স্থপতি হিসেবে তাঁর সুনাম। ১৯৬৯-এ লো কস্ট ডিজাইন কম্পিটিশানে ভারত সরকার তাঁকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেন।

পরমা-প্রকৃতি

[দূষণ ও সংরক্ষণ]

দুর্গা বসু

বি. আর্চ. (১ম শ্রেণী), এ. আই. আই. ডি., এফ. আই. আই. এ.,
এফ. আই. এস. ই., এল. বি. এ. (ক-শ্রেণী)।
রেজিস্টার্ড আর্কিটেক্ট ও ভ্যালুয়ার,
প্রাক্তন পরিদর্শী অধ্যাপক, আই. আই. টি.।

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

PARAMA-PRAKRITI

Durga Basu

প্রকাশক :

শ্রীঅরুণকুমার পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৮৬

মূল্য : ১৮·০০

শিল্পী : শ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক :

শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

পরিবেশ বিজ্ঞানের দুটি অংশ ঃ

- প্রাকৃতিক ভারসাম্য (Eco-balance) এবং
- দূষণ ও সংরক্ষণ (Pollution & Conservation)।

* * * *

প্রথমাংশের চারিটি অধ্যায়ে আমরা দেখবো জড় আর জীব কিভাবে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে যুগযুগান্ত ধরে রচনা করে চলেছিল এক অকৃত্রিম ভারসাম্য। তুলাদণ্ডের দুটি পাত্রে লক্ষ বছর ধরে সমানভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল প্রকৃতির দুই অঙ্গ—জড় ও জীবের।

* * * *

দ্বিতীয়াংশের চার অধ্যায়ে পাবো সভ্যতার অগ্রগতিতে আজ কিভাবে দুষ্ট হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে সেই ভারসাম্য। মানুষ বিনাশ করছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতি প্রতিঘাত হানছে মানুষের উপর। এ অসম যুদ্ধে মানবাত্মার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী যদি না সন্ধি হয়! আর সেই সন্ধির সর্ত—পরিবেশ সংরক্ষণ।

দুর্গা বসু

পরিবেশ দিবস
৫ জুন, ১৯৮৫
৭এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার,
কোলকাতা-৭০০০১৩

বিবিদি'র স্মৃতিতে

৫.৬.৮৫ দুর্গা বসু

সূচীপত্র ঃ

চিত্রসূচী

নকশা সূচী

প্রথমাংশ

প্রাকৃতিক ভারসাম্য

এ এক পাহাড় ঘেরা স্বচ্ছ হ্রদ, সরল নিষ্পাপ,
মেঘ আর যাযাবর হাঁসেদের ছায়া শুধু জানে।
ধ্যান তার নভোনীল। চেয়ে চেয়ে সারা নিশিদিন
সূর্যের বৃত্তান্ত থেকে পায় তার আপনার মানে।......

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

ধোঁয়াশায়, ভেজালে, খরার বিষাক্ত তাপে মানবক অসুস্থ। ঘোলাটে চোখ আধবোজা করে ঝিমোয় সারাদিন আর শিউরে শিউরে হাঁপায় সারারাত। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণীর অনেক চিকিচ্ছে যখন হার মানল তখন একদিন তার মা তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর কাছে। সাদা দাড়ির ফাঁকে আরো সাদা হাসি হেসে বদ্যিবুড়ো মানবককে চান

১ পরিবেশ বিজ্ঞান : সাধারণ তত্ত্ব
General Principles of Ecology

করাল পাহাড় ঘেরা স্বচ্ছ হ্রদের জলে। তারপর খেতে দিল তিনটে সবুজ পাতা। পাতা চিবোতে চিবোতে মানবকের চোখে জ্বলে উঠল চাঙ্গা হওয়ার নীল আলো। সে হাসল, খেলল, নাচল। মানবকের মা শুধালো, ও কি পাতা গো বদ্যি? আরো বেশী সাদা হেসে বুড়ো বল্লে, প্রকৃতির জলা-জঙ্গলে পাবি গাদা গাদা-তুলসীপাতা।

জীবন আর তার পরিবেশ একে অপরের সাহায্য ছাড়া অচল। মাছকে বাঁচাতে হলে তার জল চাই, মানুষের চাই বাতাস, উদ্ভিদের উর্বর মাটি। জীবজগতের প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ তার চারিপাশের প্রাকৃতিক বা ভৌত রাসায়নিক পরিবেশের সাথে ও পরস্পরের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ার সম্পর্কে আবদ্ধ। এই পারস্পরিক সম্পর্কেরই বৈজ্ঞানিক নাম পরিবেশ পদ্ধতি বা ইকো-সিস্টেম। এই পদ্ধতির অনুশীলনই হল **পরিবেশ বিজ্ঞান** বা ইকোলজি।

পরিবেশ মানুষকে ভাবিয়েছে তার আদিমকাল থেকে। আদিম গুহাবাসী মানুষ লালিত হয়েছে তার পরিবেশের মাঝে। প্রকৃতি ও চারপাশের জীবজগতের উপকারী ও অপকারী উপাদানগুলিকে চিনে নিতে হয়েছে বাঁচার তাগিদে। সভ্যতার জন্মমুহূর্তে মানুষ শিখেছে আগুন জ্বালাতে, চাষ করতে, কাপড় বুনতে। এককথায় তার বুদ্ধি আর বিদ্যার মাধ্যমে পরিবেশকে নিজের কাজে লাগাতে। তাই চরক-সংহিতায় আমরা পাই যে বায়ু, জল, দেশ (বা ভূমি) ও সময় জৈবিক প্রগতির মূল। গ্রীক দার্শনিক হিপ্পোক্রেটিস, অ্যারিস্টোটল প্রভৃতি মনীষীর লেখাতেও পাই পরিবেশ চিন্তা। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে থিয়োফ্রাস্টাস তো উদ্ভিদ জগতের পরিমণ্ডল ও পরিবেশ নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে গেছেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ বুফোঁ (Buffon) তাঁর ন্যাচারাল হিস্ট্রী বইয়ে মানুষ, পশু, পাখী ও গাছপালার মধ্যে পরিবেশ-পদ্ধতিগত সম্পর্ক প্রমাণ করেছেন। তাঁরই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ভাবনা নিয়ে তাঁর বিখ্যাত উত্তরসূরী ম্যালথাস সৃষ্টি করে গেছেন অকাট্য সূত্র ও তত্ত্বগুলি। এদিকে জীববিজ্ঞান লাইবিগ, আগাসিজ ইত্যাদি বিজ্ঞানীর মারফৎ এগিয়ে এসে পূর্ণতা লাভ করল ডারউইনে। ১৮৬৯-এ আর্নেস্ট হ্যাকেল প্রথম ব্যবহার করলেন 'ইকোলজি' কথাটি[১]। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইকোলজি হয়ে দাঁড়ালো এক পুরো দস্তুর বিজ্ঞান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পর্ষদ কাজ শুরু করলেন মরু ও খরা অঞ্চলের পরিবেশ নিয়ে। দেশে দেশে গড়ে উঠল পরিবেশ বিজ্ঞানের জাতীয় গবেষণাগার, পরিবেশ মন্ত্রক। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণী থেকে বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী অবধি অবশ্য-পাঠ্য হয়ে উঠছে পরিবেশ বিজ্ঞান।

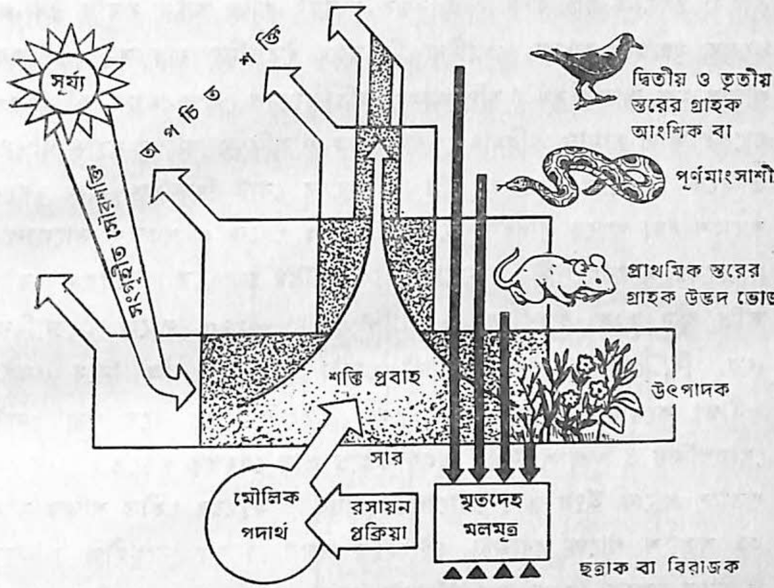
জীবকোষের প্রাণচাঞ্চল্য নির্ভর করে সেই কোষে বস্তু (Matter) ও

শক্তি (Energy)-এর আগমন, নির্গমন ও সঞ্চয়ের উপর। চৌবাচ্চার একটা নল দিয়ে জল ঢুকছে, আর একটা দিয়ে বেরুচ্ছে। ঢোকা-বেরুনোর হার যদি একই হয়, চৌবাচ্চার জলে থাকবে একটা চলমান স্থিতাবস্থা যাকে অনায়াসে তুলনা করা যায় পরিবেশগত ভারসাম্যের সাথে। এবার জলের আগমন হার কমিয়ে দিন। দেখবেন, চৌবাচ্চার জলের উচ্চতা প্রথমটা কমতে থাকবে ও পরে এক সময় আবার স্থিতাবস্থা ফিরে আসবে। কারণ জলের উচ্চতা কমে আসায় জলের চাপও কমে আসবে এবং সেই সঙ্গে কমে আসবে জল নির্গমনের হার। আগমন-নির্গমনের হার যখন সমান হবে আবার সৃষ্টি হবে স্থিতাবস্থা। ফের আগমন হার বাড়িয়ে দিন। উচ্চতা ও চাপ বেড়ে, বেড়ে উঠবে নির্গমন হার। ক্রমে ফের সৃষ্টি হবে স্থিতাবস্থা। অর্থাৎ চৌবাচ্চার জলের অবস্থা নির্ভর করছে জলের আগমন, নির্গমন ও সঞ্চয়ের উপর; ঠিক যেমনটি হয় জীবকোষের প্রাণচাঞ্চল্যের ক্ষেত্রে। চৌবাচ্চার জল ঢোকা একেবারে বন্ধ করে দিন। সব সঞ্চিত জলটুকু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে শেষ হবে জলের নির্গমন—চৌবাচ্চাও খালি, শূন্য, মৃত। এইভাবে জীবকোষেও বস্তু ও শক্তির আগমন ও নির্গমনে যে সঞ্চয়ের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, পরিবেশ পদ্ধতি বা ইকো-সিস্টেম ভেঙ্গে পড়লে সে ভারসাম্য হারিয়ে জীবকোষ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। পরিবেশ পদ্ধতিতে জীবকোষে বস্তু ও শক্তির জোগান দেয় জল, বায়ু, মাটি, খাদ্য ইত্যাদি। এই ইত্যাদিগুলির কোন একটি যদি হঠাৎ বিষিয়ে ওঠে—যদি বদলে যায় ভৌত পরিবেশ, বাতাসে যদি বেড়ে ওঠে শব্দ তরঙ্গ বা উত্তাপ, মাটি যদি হারায় তার উর্বরা শক্তি, জল যদি হয়ে ওঠে কলুষিত বা তেজস্ক্রিয়—তার কুফল দেখা দেবে জীবজগতে। ধ্বংস হবে গাছ-গাছড়া, পশু-পাখী, মানুষ। এরই নাম **পরিবেশ দূষণ**।

পাসাডেনা জেট প্রপালসান ল্যাবরেটরীর জীবরসায়নবিদ জো হ্যানসেন সম্প্রতি বোতলের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন একটি পরিবেশ পদ্ধতি বা পরিবেশ চক্র (Ecocycle)। মানুষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। সেই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে উদ্ভিদের দল। গাছের সবুজ পাতায় সূর্যের আলো পড়লে যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া (Photosynthesis) চালু হয় তাতে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে অক্সিজেন পৃথক হয়ে হাওয়ায় মিশে যায়। এই অক্সিজেন আবার নিঃশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের

ফুসফুস মারফৎ রক্তে মিশে তাকে জোগায় তার দাহিকা বা জীবনীশক্তি। অর্থাৎ প্রাণীর পরিত্যক্ত কার্বন বাঁচাচ্ছে উদ্ভিদকে আর উদ্ভিদের ছেড়ে দেওয়া অক্সিজেন রক্ষা করছে প্রাণীকে। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে নিরন্তর সৃষ্টি করে চলছে এক আবর্তন বা পরিবেশ চক্র। হ্যানসেন রসায়নাগারে কুচো চিংড়ি, এককোষী উদ্ভিদ অ্যালজি ও একজাতের কীটাণু নিয়ে একটা মাঝারী আকারে বোতলের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এক পরিবেশ চক্র যাতে এই ত্রিমূর্তি পরস্পরের পরিত্যাগ করা অংশ অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল এবং খাদ্যে পরিণত করছে। বোতলের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াটি দু বছরের উপর চালু রয়েছে। এর থেকে আশা হয়, পৃথিবীর পরিবেশ যদি কোনদিন এমন ভাবে দূষিত হয়ে পড়ে যে তা জীবজগতের বাসের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে তাহলে নোয়ার জাহাজের মত ক্যাপসুলাকৃতি কোন মহাকাশযানের কৃত্রিম পরিবেশে গাছ-গাছড়া পশু-পাখী নিয়ে দিব্যি জমিয়ে সংসার চালিয়ে যেতে পারবে মানবক।

মাটি, জল ও বাতাস—জীবনধারণের পার্থিব উপকরণ এই তিন। প্রাণী ও উদ্ভিদের সম্মিলিত জীবজগত আর তার এই জড় পরিবেশ—এরা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। অহরহ এদের মধ্যে চলেছে বস্তু ও শক্তির আদান-প্রদান। ১ নং নকশায় দেখুন সূর্যের বিচ্ছুরিত শক্তি (তাপ আর আলো) থেকে সালোকসংশ্লেষের মারফৎ পুষ্টি জোগাড় করে নিচ্ছে ঘাস, পাতা, উদ্ভিদ। এদের বৈজ্ঞানিক নাম **উৎপাদক** (Producer)। এই উৎপাদকদের কাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করছে ফড়িং, ইঁদুর, খরগোস—যাদের বলা চলে প্রাথমিক স্তরের **গ্রাহক** (First Order Consumer)। এরা সকলেই তৃণ ও উদ্ভিদভোজী (Herbivorous)। এইসব ফড়িং-ইঁদুর খেয়ে জীবনধারণ করে দ্বিতীয় স্তরের গ্রাহক (Second Order Consumer) —যেমন সাপ, ব্যাং (১ নং চিত্র)। আবার সাপ-ব্যাং উদরস্থ করে বেঁচে রয়েছে বাজপাখী, চিল, শকুন প্রভৃতি তৃতীয় স্তরের গ্রাহক[২] (Third Order Consumer)। ২য় ও ৩য় স্তরের গ্রাহকেরা সাধারণতঃ পূর্ণ বা আংশিক ভাবে মাংসাশী (Carnivorous)। খাদ্যের আদান-প্রদান মানেই বস্তুর আকৃতিতে শক্তির আদান-প্রদান। পরিবেশ চক্রের অর্ধেকটা (সূর্যরশ্মি→উদ্ভিদ→তৃণভোজী→মাংসাশী প্রাণী) আমরা দেখলাম। এইবার দেখব বাকি অর্ধেকটা। ছবিতে দেখুন উৎপাদক ও নানান শ্রেণীর



নকশা নং-১

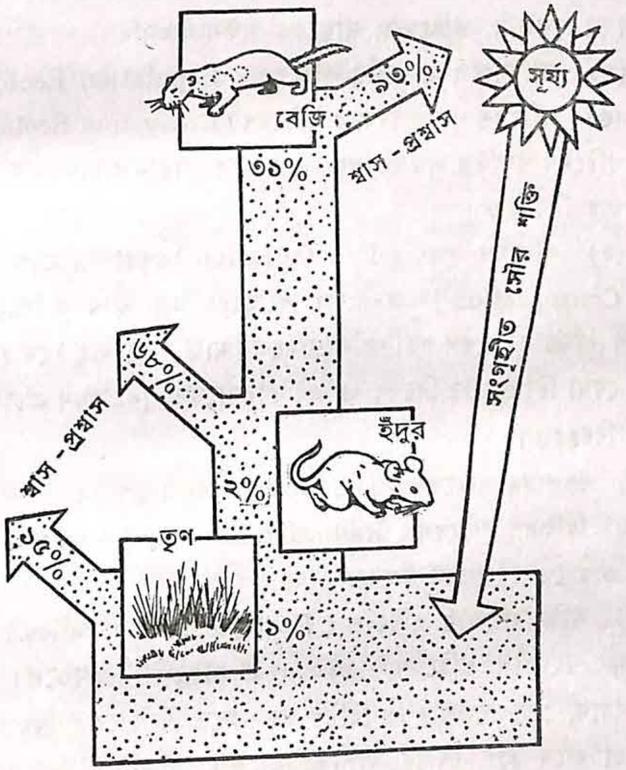
গ্রাহকদের পরিত্যক্ত মৃত দেহাবশেষ বা মলমূত্র যা মাটিতে পড়ে রয়ে গেল তা ভোগে লাগল এক ধরনের বীজাণু বা ছত্রাকের (Fungus)। এদের অপর নাম **বিভাজক** (Decomposer) বা **বিজারক** (Reducer)। এদের পুষ্টি গ্রহণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া মৃতদেহ থেকে আলাদা করে ফেলে কার্বন, অক্সিজেন, ফসফেট, নাইট্রোজেন প্রভৃতি জৈব সার বা মৌলিক জড় পদার্থ (Raw Material) যা পুষ্টি যোগায় উৎপাদক নামধারী গাছ-গাছালিকে। অর্থাৎ বস্তু ও শক্তির চক্র (Cycle) পূর্ণ আবর্তন শেষ করল (জীবের দেহাবশেষ→ছত্রাক ও জীবাণু→জৈব সার বা মৌলিক পদার্থ→উদ্ভিদ)। এই চক্রেরই নাম পরিবেশ পদ্ধতি (Ecosystem—১৯৩৫ সালে কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইংরাজ পরিবেশ বিজ্ঞানী এ. জি. ট্যানসেলে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এস. মাথাওয়ান এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—'সমস্ত জীব জগৎ ও তার জড় পরিবেশ এবং উভয়ের মধ্যে যাবতীয় বস্তু ও শক্তির আদান-প্রদানকে এককথায় বলে পরিবেশ পদ্ধতি'।)[৩]

বস্তুর আদান-প্রদানও অবশ্য শক্তির আদান-প্রদানেরই নামান্তর। আমি এক গ্লাস দুধ পান করছি বা আপনি একটা আপেল উদরস্থ করছেন—আসলে

আমরা দুজনেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মারফৎ শক্তি অর্জন করছি দুধ ও ফলের মধ্যস্থ গ্লুকোজ, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সব শক্তির মূল আকর সূর্য (যদি আমরা বহির্মহাকাশ থেকে আসা অতি বৃহৎ মাপের অতি সামান্য পরিমাণ বেতার তরঙ্গ ও অতিক্ষুদ্র মাপের মহাজাগতিক তরঙ্গকে হিসাবের মধ্যে না ধরি)। সূর্যের মোট বিচ্ছুরিত এক নগণ্য শতাংশ ধরা পড়ছে পৃথিবীর বুকে। তার ১ থেকে ৫ শতাংশ সালোক-সংশ্লেষের মারফৎ পুষ্টি জোগাচ্ছে তাবৎ উদ্ভিদ জগতকে। তারও একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ গ্রহণ করছে প্রাণিজগত। ১৯৬০ সালে বৈজ্ঞানিক এফ. বি. গোলি তৃণ, তৃণভোজী মেঠো ইঁদুর ও বেজি নিয়ে একটা পরীক্ষা করেছিলেন যাতে দেখা গেল উদ্ভিদের গায়ে এসে পড়া মোট সৌরশক্তির ১ শতাংশ উদ্ভিদ গ্রহণ করছে তার দেহতন্তু গড়তে। এর দুই শতাংশ পাচ্ছে ইঁদুর তার ভোজ্যের মারফৎ। ইঁদুরের গৃহীত শক্তির মাত্র ৩১ শতাংশ পাচ্ছে বেজিটা ওই ইঁদুর ভক্ষণ করে। সংগৃহীত শক্তির, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ, ইঁদুরের ক্ষেত্রে ৬৮ শতাংশ ও বেজির ক্ষেত্রে ৯৩ শতাংশ নষ্ট হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে (২ নং নকশা)। ১ নং নকশায় দেখুন উৎপাদক থেকে ৩য় স্তরের গ্রাহক (একটু ভাবুন, মানুষও এই ৩য় স্তরের গ্রাহক… …কতটুকু চাহিদার জন্য কি বিপুল তার বিশ্বব্যাপী অনাচার, অপব্যয়, অকারণ অপচয়!) পর্যন্ত শক্তির ব্যবহার নিচে থেকে উপরে পিরামিডাকৃতিতে কমে এসেছে। কেবল শক্তির ব্যবহার নয়—সংখ্যা ও মোট দৈহিক জৈব পদার্থ (Biomass) হিসাবে ধরলেও একই ধরনের পিরামিডের ছবি ফুটে উঠবে যে-কোন ভারসাম্য যুক্ত পরিবেশ পদ্ধতির ক্ষেত্রে। যখন কোন এক স্তরের গ্রাহক সংখ্যা (যেমন বর্তমানে হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে) বা মোট দৈহিক জৈব পদার্থ (যেমন হয়ত হয়েছিল সাড়ে ছ কোটি বছর আগে ডাইনোসরদের ক্ষেত্রে) যদি হঠাৎ বেড়ে যায় অস্বাভাবিক ভাবে তাহলে সংখ্যা, বায়োমাস ও সেই সঙ্গে শক্তি চাহিদার পিরামিডও মাথাভারী বা পেটভারী আকৃতি গ্রহণ করে হারাবে তাদের ভারসাম্য। এর ফল, সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পদ্ধতির অন্তর্গত সব উদ্ভিদ ও প্রাণীরই জীবন সঙ্কট!

অধ্যাপক জি. এ. পিট্রিদেস ১৯৬৮ সালে তাঁর গবেষণাপত্রে পরিবেশ বিজ্ঞানের হিসাবে বলেছেন জীবজগতের সংস্থান, সংখ্যাবিন্যাস, প্রজনন,

অভিব্যক্তি ও জৈব কল্যাণ নিয়ন্ত্রক পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভাবনাকে বলা হয় পরিবেশ বিজ্ঞান। অর্থাৎ মানুষের সংস্থান, সংখ্যাবিন্যাস, প্রজনন, অভিব্যক্তি ও জৈবিক কল্যাণও এর অন্তর্গত। আজ যখন মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছে তখন এ শাস্ত্র যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি !



নকশা নং-২

পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে আজ চিন্তা-ভাবনা করছেন নানা মানুষ তাঁদের নিজের নিজের ক্ষেত্রগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এর মধ্যে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ, নগর পিতা, কৃষিবিদ, ভৌগোলিক, স্থপতি, সমাজতত্ত্ববিদ, খাদ্যবিশারদ, ডাক্তার, নৌশাস্ত্রবিদ, সাগর বিশারদ, ভূতত্ত্ববিদ, বনপালক, প্রাণিতত্ত্ববিদ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, শব্দবিজ্ঞানী ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল মানুষ। ফলে পরিবেশ বিজ্ঞানও আজ নানা দিকে শাখা-প্রশাখা

মেলে পূর্ণতর হয়ে উঠছে প্রতিদিন। তার বহু শাখার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য :

* (ক) মানব প্রজাতি সম্পর্কীয় পরিবেশ (Human Ecology)।

* (খ) প্রাণিসমাজ সম্পর্কীয় পরিবেশ (Community Ecology)।

* (গ) নিবাসন পরিবেশ (Habitat Ecology)—নিবাসনের বিন্যাস হিসাবে পরিবেশের শ্রেণী বিভাগ হতে পারে—মিঠা জল, মরু, বনভূমি, ঘাসজমি বা তৃণভূমি, কৃষিক্ষেত্র, সামুদ্রিক অঞ্চল ইত্যাদি।

* (ঘ) প্রাণিসংখ্যা সম্পর্কীয় পরিবেশ (Population Ecology)।

* (ঙ) পরিবেশ পদ্ধতি বিষয়ক পরিবেশ (Ecosystem Ecology)—বিভিন্ন পরিবেশ পদ্ধতির অন্তর্গত জড় ও জীবের আদান-প্রদানমূলক ক্রিয়া-কলাপ এর বিষয়ভুক্ত।

* (চ) পরিবেশ দূষণ (Eco-Pollution) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ (Eco-Conservation)—জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং কৃষি ও শিল্পোন্নতির ফলস্বরূপ বিভিন্ন পরিবেশ পদ্ধতির জড়জগতে (মাটি, জল, বায়ু) যে ভারসাম্য হীনতা দেখা দিচ্ছে তার বিবরণ ও ওই ভারসাম্যের পুনঃ সৃজন প্রয়াসই এই শাখার বিষয়বস্তু।

(ছ) উৎপাদন পরিবেশ (Production Ecology)।

(জ) বিকিরণ পরিবেশ (Radiation Ecology)—মূলতঃ তেজষ্ক্রিয় বস্তু ও তার তেজষ্ক্রিয়তাই বিবেচ্য বিষয়।

(ঝ) শক্তি সম্পর্কীয় পরিবেশ (Ecological Energetics)।

(ঞ) মহাকাশ পরিবেশ (Space Ecology)—ভূমণ্ডলের বাইরে মহাকাশযান, স্পেশ স্টেশান ও বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রে কি ভাবে পার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে তাই এখানে আপাতঃ আলোচ্য বিষয়।

* (ট) ভূ-পরিবেশ (Eco-Geography)।

* (ঠ) আবহ পরিবেশ (Atmospheric Ecology)।

(ড) রাসায়নিক পরিবেশ (Chemical Ecology)।

(ঢ) ভূসম্পদ পরিবেশ (Resource Ecology)।

(ণ) জনন পরিবেশ (Genetic Ecology) ইত্যাদি[৪]।

এই ছোট বিজ্ঞান পুস্তিকায় সব শাখার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব; নিস্প্রয়োজনও। এই পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানানুরাগী বাংলাভাষী পাঠকের

সামনে পরিবেশ বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্ত্ব তুলে ধরে পশ্চিম বাংলায় পরিবেশগত দূষণ ও সংরক্ষণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। কাজেই এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে যে ক'টি শাখার তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে সেগুলিকে পূর্বলিখিত তালিকায় তারকা চিহ্নিত করা হল।

পৃথিবীর প্রধান প্রধান যে সব **পরিবেশ পদ্ধতি** আমাদের আলোচনায় বারম্বার আসবে সেগুলি হল, (১) কৃষি বর্গজ, (২) মিঠাজলীয়, (৩) সামুদ্রিক, (৪) বনভূমিজ, (৫) তৃণভূমিজ ও (৬) মরুদেশীয়। এদের উৎপাদক ও গ্রাহকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১ নং সারণীতে দেওয়া হল (২, ৩ ও ৪ নং চিত্র):

১ নং সারণী

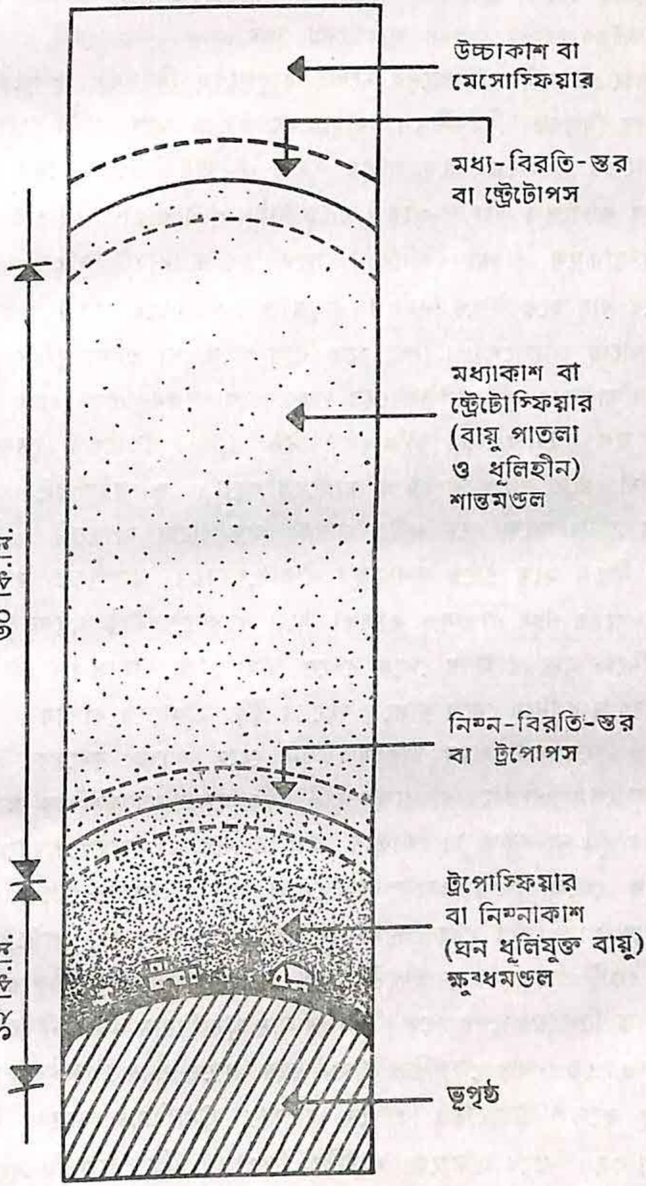
পরিবেশ-পদ্ধতি	উৎপাদক	উদ্ভিদভোজী গ্রাহক	মাংসাশী গ্রাহক
কৃষি বর্গজ	শস্য ও সহজাত আগাছা	কীট, পতঙ্গ, ইঁদুর, খরগোস, পাখী	ব্যাং, সাপ, মানুষ ইত্যাদি
মিঠাজলীয়	ভাসন্ত, জলমগ্ন বা তীরস্থ জলজাত উদ্ভিদ	জলজ পোকা-মাকড়, শামুক-গুগলী, ছোট মাছ	ঐ
সামুদ্রিক	ভাসন্ত উদ্ভিদ কণিকা (ফাইটো-প্লাংকটন)	ঐ	হাঙ্গর, তিমি, কড মাছ ইত্যাদি
বনভূমিজ	পর্ণমোচী বা চিরহরিৎ বনরাজি	পিপড়ে, পোকা, বোলতা, মৌমাছি, মাকড়সা, উই, কাঠবেড়ালী ইত্যাদি	বাঘ, সিংহ, শেয়াল, বনবিড়াল, নানান পাখী, মানুষ ইত্যাদি
তৃণভূমিজ	ঘাস ও আগাছা	তৃণভোজী পশু পাখী, পোকা-মাকড়	সাপ, ব্যাং, পাখী ও মানুষ
মরুদেশীয়	ক্যাকটাস জাতীয় কাঁটা গাছ	সামান্য কিছু তাপ সহনশীল পোকা, ইঁদুর, উট	—

এছাড়াও আর একটি পরিবেশ পদ্ধতি রয়েছে যা মিঠাজল বা সামুদ্রিক নোনাজল কোনটার মধ্যেই পড়ে না—তা হল মোহনা বা নদীমুখ। ভারতের একটি প্রধান মোহনা হল হুগলী ও মাতলা নদীর সাগর-সঙ্গম। এটি ভারতের বৃহত্তম মোহনা, ৩১০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন। জলের লবণাক্ততা প্রায় শূন্য থেকে সাড়ে তেত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে-কমে। উৎপাদক বলতে জলস্রোতে ভাসমান ডায়াটম, সবুজ অ্যালগি, নীল সবুজ অ্যালগি। গ্রাহক বলতে জলজ পোকা, চিংড়ি, ইলিশ জাতীয় মাছ ও মাছের পোনা। মোহনার সঙ্গে যুক্ত নোনাজলের খাল-বিল-জলায় লবণ সহনশীল বহু উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়—যারা মূলতঃ জলচর।

পৃথিবীপৃষ্ঠের পর আসবে উপরের বায়ুমণ্ডলী। মানুষ দিনে ২২০০০ বার নিঃশ্বাস নেয় যার জন্য প্রয়োজন দৈনিক ৩৬, ০০,০০,০০০ (৩৬ কোটি) পাউণ্ড বাতাস। মানুষ বিনা খাবারে বাঁচে ৫ সপ্তাহ, বিনা জলে ৫ দিন, বিনা বাতাসে ৫ মিনিটও না। এ তো শুধু একটা প্রজাতি-মানুষ। এ ছাড়াও পৃথিবীতে রয়েছে ১০,৭৫,০০০ জাতের প্রাণী ও ৩,৫০,০০০ জাতের উদ্ভিদ—বাতাস বিহনে যার প্রত্যেকটিই অচল। কাজেই পার্থিব জীবনের পক্ষে বায়ুমণ্ডলের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ৩নং নকশায় দেখুন, ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি ব্যাপ্ত নিম্নাকাশ বা ট্রপোস্ফিয়ার। এর ঘনীভূত বায়ুতে নিরন্তর চলছে ঝড়ের খেলা, ধুলোর উড়াউড়ি (পরীক্ষা করে দেখা গেছে সাহারা মরুর ধূলিকণা বাতাসে ভাসতে ভাসতে আরব সাগর পেরিয়ে ভারতে এসে পৌঁছায় ; হাওড়ার কল-কারখানার ধোঁয়াশা হানা দিচ্ছে দীঘার সমুদ্র উপকূলে !)। ট্রপোস্ফিয়ারের উপর ৬০ কি. মি. পুরু স্ট্রেটোস্ফিয়ার বা মধ্যাকাশ যার বায়ু পাতলা, ধুলো-ধোঁয়া বিহীন। এর উপর শুরু হল মহাকাশের সীমানা—ঊর্ধ্বাকাশ বা মেসোস্ফিয়ার। প্রতিটি আকাশের নিজস্ব তাপমাত্রা নির্দিষ্ট। এই তাপ-মাত্রার পরিবর্তন হয় দুটি আকাশের মাঝে এক একটি বিরতি স্তরে যাকে বলা হয় ট্রপোপস ও স্ট্রেটোপস। পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রধানতঃ আলোচ্য ট্রপোস্ফিয়ার ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধিতে তার দূষণ।

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুন সুইডেনের স্টকহলমে সমবেত বিশ্বের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা এক কাট্টা হয়ে যুদ্ধঘোষণা করলেন দূষণের বিরুদ্ধে। এই দূষণ ব্যাপারটা ঠিক কি তা বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে প্রকৃতির কোলে

নিয়ত যে সমস্ত জৈব ভূ-রসায়ন চক্রের আবর্তন চলেছে সেগুলিকে। তার মধ্যে প্রধান জলচক্র (Hydrocycle), কার্বন ডাই-অক্সাইড চক্র,

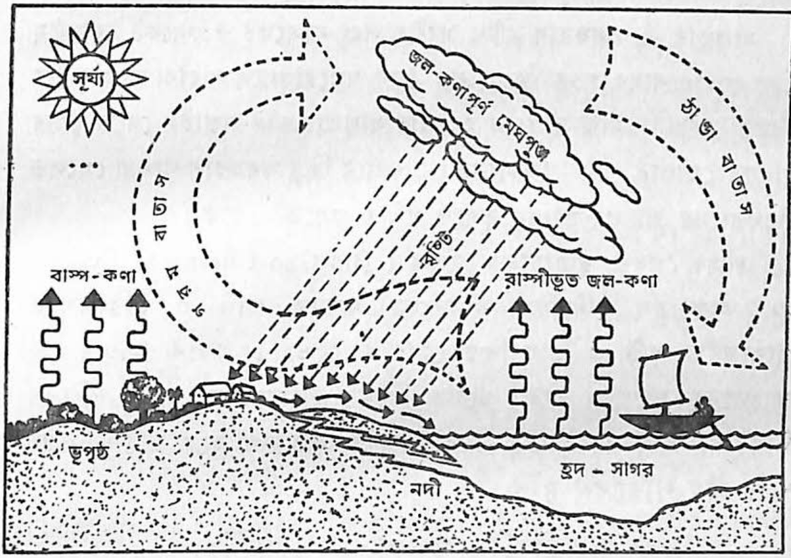


নকশা নং-৩

অক্সিজেন চক্র, সালফার চক্র ও নাইট্রোজেন চক্র[৫]। আগে দেখা সৌর শক্তি চক্রের মত এইসব বস্তুকণিকা ক্রমাগত আবর্তিত হচ্ছে জড় থেকে জীবে, জীব থেকে জড়ে। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের অনেকখানিই নির্ভর করছে এইসব চক্রের যথাযথ আবর্তনের উপর।

জলচক্রের সঠিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই বায়ুস্তরের নির্মলতা, ভূ-পৃষ্ঠের ও জলস্তরের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। বায়ুস্তরের জলীয় অংশ বৃষ্টির আকারে, তুষারপাতের আকারে ঝরে পড়ছে সমুদ্রে (মোট পতিত জলের সাড়ে সাতাত্তর শতাংশ) এবং ভূ-পৃষ্ঠে (সাড়ে বাইশ শতাংশ)। এই সঙ্গে নেমে আসছে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, জলে দ্রবণীয় নানান দূষিত পদার্থ। এইভাবে বায়ু হয়ে উঠছে নির্মল। সমুদ্র ও ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভূত যে জল ফিরে যাচ্ছে আকাশে তা কিন্তু বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না ওইসব দূষিত ধুলো, অ্যাসিড বা লবণ। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে যে পাতন ক্রিয়া হচ্ছে তাতে বিশুদ্ধ জল (Distilled Water) উঠে যাচ্ছে আকাশে। দূষণকারক বস্তু জমা থেকে যাচ্ছে ভূপৃষ্ঠে ও সাগরের জলে। ভূ-পৃষ্ঠের দুষ্ট পদার্থও আবার বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীর মারফৎ বয়ে যাচ্ছে সাগরে। এইভাবে মাটিও বিশুদ্ধ হয়ে উঠছে জলচক্রের লীলা-খেলায়। বাষ্পীভূত জলকণার মত ভূ-পৃষ্ঠের গরম বাতাসও হালকা বলে আকাশে উঠে যাচ্ছে ও তার স্থান নিচ্ছে সমুদ্রের উপর থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা বাতাস। এই ঠাণ্ডা বাতাসের স্থান নিতে নেমে আসছে সমুদ্রের উঁচু আকাশের বাতাস। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে ওঠা গরম বাতাস এখন ধেয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের উপরের উর্ধ্বাকাশে। এইভাবে বাতাসেও সৃষ্টি হচ্ছে জলচক্রের মত এক চক্রাকার আবর্তন (৪ নং নকশা)। বাতাস এবং জলের এই নাগরদোলায় চড়ে আকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সমুদ্র ও সেখান থেকে পুনরায় আকাশে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে কার্বন, অক্সিজেন, সালফার, নাইট্রোজেন। আর একটি ভয়াবহ চক্র ইদানীং শুরু হয়েছে মানুষের নির্বিকার চিত্তে আণবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে। এটির নাম স্ট্রনাসিয়াম—৯০···ইউরেনিয়াম পরমাণুর এক দুরন্ত তেজস্ক্রিয় (২৮ বছর লাগে তার তেজস্ক্রিয়তা কমে অর্ধেক হতে) উপাদান। পশ্চিম বাংলায় স্ট্রনাসিয়াম চক্রের উৎপাত এখনো কম। তবে এ রাজ্যে আণবিক ক্রিয়াকর্ম বৃদ্ধি পেলে কি হবে বলা শক্ত[৬]।

বাকি চক্রগুলির মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসীয়, বাকি দুটি জলে দ্রবণীয়। উদ্ভিদ বাতাসের কার্বন গ্রহণ করে সালোকসংশ্লেষ মারফৎ, বর্জনা করে অক্সিজেন। প্রাণীর ক্ষেত্রে ঘটে ঠিক উল্টোটা—গৃহীত হয় অক্সিজেন ও বর্জিত হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই দুই চক্রের



নকশা নং-৪

মাঝে উদ্ভিদ ও প্রাণী পরস্পরের পরিপূরক হয়ে রক্ষা করে **পরিবেশগত ভারসাম্য**। এর যে-কোন একটি চক্রের কমতিতে বা আধিক্যে নষ্ট হতে পারে এই ভারসাম্য। ফলং—অভিযোগ শোনা যাবে (এবং আজকাল আখছারই শোনা যাচ্ছে) তরি-তরকারী আগের মত স্বাদ হয় না, জালে মাছ পড়ার পরিমাণ আগের থেকে অনেক কমে গেছে, ভাতের মিষ্টতাও সেরকম নেই। নাইট্রোজেন হচ্ছে প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিডের মূল উপাদান। এই প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড আবার জীবজগতের অন্যতম মূল উপাদান। কাজেই জৈবিক ভারসাম্যের জন্য নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা বড় একটা কম নয়। তবে বাতাসে মিশে থাকা নাইট্রোজেনকে সরাসরি গ্রহণের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ব্যাক্টেরিয়া বাদে প্রাণী-উদ্ভিদ কারুরই নেই। নাইট্রেট জাতীয় দ্রবণীয় নাইট্রোজেনঘটিত লবণ থেকে উদ্ভিদ গ্রহণ করে প্রয়োজনীয়

নাইট্রোজেন। উদ্ভিদের দেহজাত অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন থেকে প্রাণী সংগ্রহ করে চাহিদামাফিক নাইট্রোজেন। কৃষি-বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণের উপযুক্ত করে উদ্ভিদকে গড়ে তোলা। সফল হলে কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার প্রয়োগ বন্ধ হবে। খরচ কমবে, কমবে পরিবেশদূষণ।

সালফার ও ফসফরাস ঘটিত দ্রবণীয় লবণ সালফেট ও ফসফেট যথাক্রমে জৈব দেহাবশেষের পচন ক্রিয়া এবং জৈব অঙ্কুরোদ্‌গমে সাহায্য করে মাটির ভিতর থেকে। মাটি বাতাসে ভাসমান সালফার ডাই-অক্সাইড থেকে বৃষ্টির মারফৎ জোগান পায় সালফারের। এভাবে কিছু ফসফরাস পাওয়া গেলেও ফসফরাসের আসল জোগান ভূগর্ভে সঞ্চিত ফসফেট থেকে।

এইসব জৈব ভূ-রাসায়নিক চক্রের (Bio-Geo-Chemical Cycle) মূল কাজ হল সুনিয়ন্ত্রিত আবর্তনের মাধ্যমে প্রাণী ও উদ্ভিদজগতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও প্রাণশক্তির জোগান দেওয়া। কোন কারণে এই আবর্তনের ছন্দপতন হলেই চক্রের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় এবং পরিবেশ উদ্ভিদ বা প্রাণী বা উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর মারাত্মক হয়ে উঠে। এরই অপর নাম **পরিবেশ দূষণ**।

এত ভিড় কিলবিল, ক্ষুধা-ভয়-অন্ধতা-তাড়িত।
এত গোল, দিশাহারা ধূলি ধূম্র আকাশ বধির!
জর্জর হৃদয় তবু কি বিশ্বাসে সব কিছু সয়?
হিজিবিজি এ প্রলাপ-এরও হবে প্রাঞ্জল অন্বয়।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

সে অন্বয়েরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বুঝি পরিবেশ সংরক্ষণ!

---

১. কোটপাল ও বালি ২. তারকমোহন দাস ৩. কোটপাল ও বালি ৪. কোটপাল ও বালি ৫. সলিল লাহিড়ী, ৬. কোটপাল ও বালি।

একদা জগৎ ছিল একার্ণব, জলমগ্ন। আজ যেখানে আমাদের ভারত শুয়ে রয়েছে নাগাধিরাজ হিমালয়ের পায়ের কাছে, ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবী জুড়ে সেখানে টলমল করত বিশাল মহাসমুদ্র টেথিস (Tethys)। এই মহা সংপ্লাবন থেকে পৃথিবী উদ্ধার কামনায় নারায়ণ বরাহরূপে জলে প্রবেশ করলেন। বিষ্ণুপুরাণের কিংবদন্তী অনুযায়ী 'ততঃ সমুৎক্ষিপ্যধরাং স্বদংষ্ট্রয়া মহাবরাহঃ স্ফুট পদ্মলোচনঃ। রসাতলাদুৎপল পত্র সন্নিভঃ সমুত্থিতো নীল ইবাচলো মহান ॥ ('তদনন্তর উৎপলপত্র সন্নিভ প্রফুল্ল পদ্মলোচন মহাবরাহ নিজ দন্ত দ্বারা ধরাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রসাতল হইতে মহান

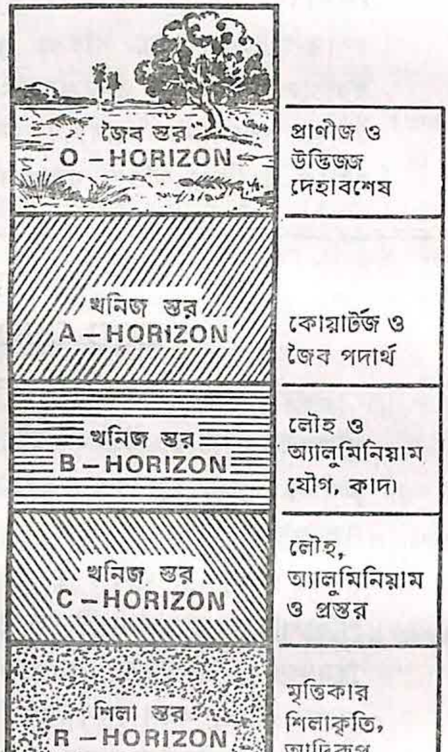
২

ভৌগোলিক পরিবেশ
ECO-GEOGRAPHY

নীলাচলের ন্যায় উত্থিত হইলেন'—পঞ্চানন তর্করত্ন)। জন্ম হল বিশাল মহাদেশ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ডের। সাগরের বুকে ফুটে উঠল ভারত ও তিব্বতের মৃন্ময়ী ছবি। ক্রমে এই দুই দেশের পারস্পরিক চাপে মাটি ফুড়ে জেগে উঠল হিমালয়। এইভাবে ভৌগোলিক পরিবেশে জলের রাজ্যে অংশ নিল স্থল ও স্থলাভিষিক্ত জীব। 'উত্তিষ্ঠতস্তস্য জলার্দ্রকুক্ষে—মহাবরাহস্য মহীং বিধার্য। বিধুন্বত বেদময়ং শরীরং রোমন্তরস্থা মুনয়ো জুষন্তি ॥' (মহীকে ধারণ করিয়া উত্তিষ্ঠমান আর্দ্রদেহ কম্পিতকায় মহাবরাহের বেদময় শরীরস্থ রোমে মুনিগণ আশ্রিত হইলেন।)

ভূ-গোলকের দুটি অংশ—স্থল এবং জল। এই অধ্যায়ে আমরা এই দুইয়েরই পরিবেশ নিয়ে অনুশীলন করব। প্রথমে স্থল বা মাটি। তারপর জল বা সামগ্রিকভাবে জলচক্র।

মাটির কোলে আশ্রিত জীব অসংখ্য—মাটির উপর বিচরণশীল প্রাণী ও সবুজ উদ্ভিদ ছাড়াও মাটির ভিতর গর্তের মধ্যেও রয়েছে অসংখ্য পোকা-



নকশা নং-৫

মাকড়-সরীসৃপ। মাটিই হচ্ছে জড় ও জীবের সেতুবন্ধ যার উপাদান হিসাবে পাওয়া যায় নানা রাসায়নিক জৈব ও অজৈব উপাদান, জল ইত্যাদি। ভূ-পৃষ্ঠের সবার উপর রয়েছে জৈব স্তর (Organic Horizon)-এর

নিচে তিনটি খনিজ স্তর (A, B, & C Horizons)। সব নিচে ভূ-কেন্দ্রের গঠনে রয়েছে শিলা স্তর (Rock Horizon)[১]। জৈব স্তরে মাটির সঙ্গে মিশে আছে ভূ-গর্ত ও ভূ-পৃষ্ঠের বহুশত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ। পচন ক্রিয়া এই স্তরে সদাঘটমান। জীবনের চিহ্ন এই স্তরের অঙ্গে অঙ্গে। খনিজ এ-স্তরেও কিছু কিছু জৈব পদার্থ পাওয়া যায়। মূল খনিজ পদার্থ বলতে কোয়ার্টজ বা স্ফটিক। বি-স্তরে কাদার সঙ্গে মিশে থাকে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। কঠিনতর মাটির স্তর এটি। সি-স্তরের প্রধান উপাদান পাথুরে মাটি বা নরম ভঙ্গুর মাটি হয়ে আসা পাথর। শিলাস্তরে মাটির আদি পিতা প্রস্তর এখনো তার প্রস্তর রূপ ধরেই রয়েছে (৫নং নকশা)।

মাটির শ্রেণীবিভাগ হয় তার দানা বা কণার মাপের উপর[২]:

২নং সারণী

		মাটির নাম		
দানার নাম	ব্যাস	বেলে	দোঁয়াশ	এঁটেল
পাথুরে নুড়ি	৫ মি. মি.	শতাংশ	শতাংশ	শতাংশ
পাথর কুচি	২ ”	—	—	—
মোটা বালি	০·২ ”	৮০-৯৫	২৩-৬২	৫-৪০
মিহি বালি	০·০২ ”			
পলি মাটি	০·০০২ ”	৫-১৫	২৮-৫০	৫০-৮৮
কর্দম	আরো ক্ষুদ্র	০-৫	১০-২৭	৭-১০

এছাড়া আছে রং-বিচার। মাটির রং যত গাঢ় হবে, বুঝতে হবে মাটিতে জৈব উপাদান তত বেশী। যে মাটিতে সেচের জল ভাল ভাবে নিঃসরিত হয়ে যায় তার রং গাঢ় বাদামী থেকে গাঢ় কালচে। জল বসা মাটির রং ফ্যাকাশে। মাটিতে লোহার যৌগ থাকলে তার রং হবে লালচে বা হলদেটে। কোয়ার্টজ, চুনের যৌগ, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদির উপস্থিতি বোঝায় মাটির সাদাটে ছাই ছাই রং। এ সব মৌলিক ও যৌগ ছাড়াও

মাটিতে রয়েছে জল—৫ থেকে ২৫ শতাংশ আয়তন জুড়ে। অন্যান্য মৌল ও যৌগ পদার্থের শতকরা হিসেব (গড়) হল ঃ

অক্সিজেন—৪৬%	ক্যালসিয়াম—৪%
সিলিকন—২৮%	পটাসিয়াম—২·৬%
অ্যালুমিনিয়াম—৮%	ম্যাগনেসিয়াম—২%
লোহা—৫%	সোডিয়াম—৩%

অন্যান্য—১·৪%

মাটির অম্লত্ব/ক্ষারত্ব (pH Value) উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৩। পি-এইচ নির্দেশক সংখ্যা ৭ বোঝায় মাটি বা জলের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব দুটোই সমান। মাটি অম্ল (Acidity)-ও নয়, ক্ষার (Alkalinity)-ও নয়। ৭·০-১৪ পর্যন্ত নির্দেশক সংখ্যা মাটি বা জলের ক্রমবর্ধিত ক্ষারত্ব বোঝায়। ০-৭·০ পর্যন্ত বোঝায় ক্রমক্ষয়িত অম্লত্ব। কোন মাটির পি-এইচ নির্দেশক সংখ্যা ৪-এর নিচে গেলে তার অম্লত্ব তাকে কৃষির অনুপযোগী করে তুলবে। আবার ১০-এর উপরে উঠলে অনুপযোগিতা আসবে ক্ষারের আধিক্যের দরুন। বর্ষাসজল ক্রান্তিমণ্ডলে জমি অম্লভাবাপন্ন হয়। নিরক্ষরেখীয় শুকনো মরু অঞ্চলে মাটি ক্ষার ভাবাপন্ন হয়। উপরের মাটিতে থাকে অম্লভাব, নিচের মাটিতে ক্ষারভাব। মানুষ অবিবেচকের মত কৃষি জমির ব্যবহার ও মাত্রারিক্ত সেচ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে কৃষি জমির পি-এইচ সূচক সংখ্যাকে ৪-এর নিচে বা ১০-এর উপরে তুলে ফেলছে। ফল—এই সব জমি পরিণত হচ্ছে পতিত জমিতে। এরই বৈজ্ঞানিক কেতাবী পরিভাষা ভূমিদূষণ বা ভূমিক্ষয়।

ভূতত্ত্ববিদদের মতে ভারতের মাটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পলি (২) লাল মাটি (৩) কৃষ্ণমৃত্তিকা (৪) পাথুরে ল্যাটেরাইট। এ ছাড়া আছে পার্বত্য মাটি, লবণাক্ত ও ক্ষার মাটি (মরু ও জলাভূমির মাটি)। পলিতে সর্বাধিক ০·৫৪ শতাংশ ফসফরাস ও ০·০৪ শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থান ভাঙ্গার নামক প্রাচীন পলিমাটির এলাকায় পড়ে। কোলকাতার পশ্চিম দিক থেকে নবীন পলিমাটি বা খাদার মাটির অঞ্চল। পশ্চিমবাংলার পলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—গাঙ্গেয় পলি (রং ধূসর থেকে সাদাটে, ফসফেট ও পটাশ ০·১-০·১৫% ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশী। গাঙ্গেয় নিম্নভূমিতে এঁটেল মাটি পাওয়া

যায় যাতে পটাশের আধিক্য থাকে) এবং বিন্দ পলি (হুগলী, বর্ধমান, বীরভূমে প্রাপ্য এই মাটিতে ফসফেট ও নাইট্রোজেনের ভাগ মোটামুটি ভাল)। অম্লশিলা থেকে উৎপত্তি লালমাটিতে (উপকূলের ব-দ্বীপ ও উত্তর আসামে পাওয়া যায়)। মাটিতে লৌহ অক্সাইডের উপস্থিতি রং-এর জন্য দায়ী। লাল মাটির গভীরতা ২/৩ ফুটের বেশী হয় না। কৃষ্ণমৃত্তিকা মূলত দাক্ষিণাত্যের মাটি। ক্যালসিয়াম ফেলস্পার ও হিউমাস (জৈব দেহাবশেষ) থাকায় মাটির রং কালো। ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ও পটাশের পরিমাণ ভাল। ফসফরাস ও নাইট্রোজেন কম (০·০৫%)। লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ১০%। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে পাওয়া যায় ল্যাটেরাইট নামক অম্ল-মাটি (পি-এইচ সূচক ৬-এর মত)। নাইট্রোজেন, ফসফেট ও জৈব কার্বন আছে কমবেশী। শিলা চূর্ণ হয়ে জন্ম নেয় পার্বত্য মাটি (দার্জিলিং-এর সিঙ্কোনা মাটি বা তরাইয়ের চা মাটি হচ্ছে এই জাতের)। জলের সাথে গড়িয়ে নিচে নেমে আসে; ফলে এর গভীরতা খুব বেশী হয় না। জৈব পদার্থ হিউমাসের পরিমাণ ভাল, একটু ক্ষার ভাবাপন্ন। মরুমাটি (ক্ষারধর্মী) পশ্চিমবঙ্গে নেই, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের মাটি। নিম্নবঙ্গের সুন্দরবন, নদীর মোহনা বা ব-দ্বীপ অঞ্চল, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় ঈষৎ অম্লধর্মী জলার মাটি। এ মাটিতে থাকে প্রচুর জৈব পদার্থ ও লোহার যৌগ (যে কারণে মাটির রং হয় নীলচে ধূসর)। নানা ধরনের মাটি থাকায় ভারতে পরিবেশ ও ভূমি সংরক্ষণের সাথে সাথে বৈচিত্র্যময় কৃষিকাজ সম্ভব। উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার না করেও উপযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত ফসল নির্বাচন করে যথেষ্ট বৈপ্লবিক উৎপাদন সম্ভব।

জমির জৈব পদার্থ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে চার শ্রেণীর জীব:

১. উদ্ভিদ কণা বা বীজাণু (Microflora)

২. প্রাণী কণা বা জীবাণু (Microfauna)

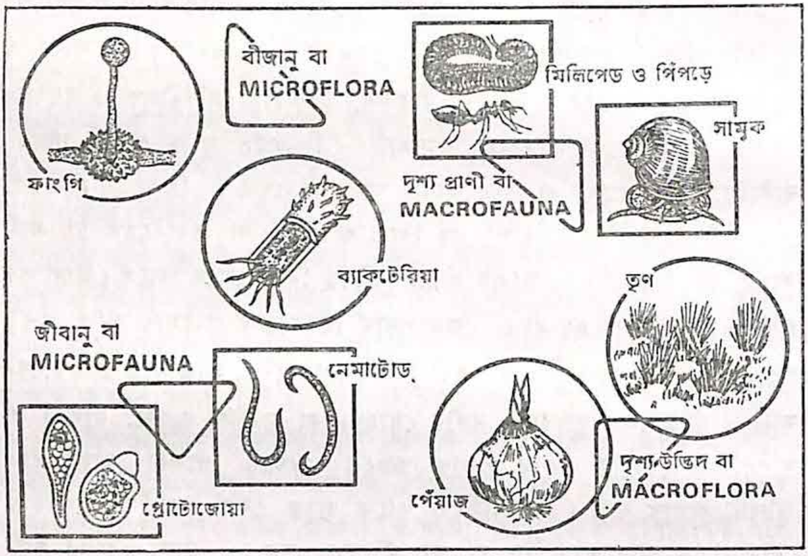
৩. খালি চোখে দৃশ্য উদ্ভিদ (Macroflora)

এবং ৪. খালি চোখে দৃশ্য প্রাণী (Macrofauna)।

উদ্ভিদ কণার উদাহরণ ব্যাক্টেরিয়া (যারা জৈবদেহাবশেষে পচন ক্রিয়ার জন্য দায়ী। উদ্ভিদকে নাইট্রোজেন যোগায় রিজোবিয়াম, আজো-ব্যাকটার ইত্যাদি উপকারী ব্যাক্টেরিয়া); ফাঙ্গি বা ছত্রাক (পরজীবী ছত্রাক উদ্ভিদে

রোগ ছড়ায় বলে অপকারী কিন্তু স্বজীবী ছত্রাক উর্বর করে তোলে); অ্যালজি বা শৈবাল (সবুজ, নীল সবুজ, হলদে ও ডায়াটম—চার শ্রেণীর অ্যালজিই জমির উর্বরতা বাড়াতে দারুণভাবে সহায়ক)।

প্রাণী কণার মধ্যে রয়েছে অ্যামিবা প্রভৃতি প্রটোজোয়া বা এককোষী প্রাণী ও নেমাটোড নামক বহুকোষী। প্রটোজোয়াদের খাদ্য ব্যাক্টেরিয়া আর নেমাটোডের খাদ্য প্রটোজোয়া। পরিবেশ ভারসাম্যের এ এক



নকশা নং-৬

অণুবীক্ষণ সংস্করণ। ২০০০ জাতের নেমাটোডের বেশীর ভাগই কিন্তু কৃষির শত্রু (৬নং নকশা)। এরপর বড় আকারের উদ্ভিদ যা দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিস্প্রয়োজন। দৃশ্যমান বিশাল উদ্ভিদ জগৎ-এর অন্তর্ভুক্ত যা ৩ লক্ষেরও বেশী জাতের হতে পারে। বড় প্রাণীর হিসাব শুরু হবে কীট-পতঙ্গের লার্ভা, ছার, উইপোকা (Mite), শুঁয়োপোকা, ফড়িং থেকে শুরু করে বাঘ, সিংহ, ঘোড়া, জিরাফ, উট, মানুষ, বাঁদর, গাধা, সাপ, বনমানুষ, হাতি—এককথায় যাবতীয় স্থলচর প্রাণী।

স্থল পরিবেশের পর আলোচ্য **জল পরিবেশ**। জীবনের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম জলেই। শুধু তাই নয়, জীববিজ্ঞানীদের ধারণা খুব সম্ভবতঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলের অণু থেকেই জীবনের উৎপত্তি।, ভূ-পৃষ্ঠের

৭৫ শতাংশ ঢেকে রয়েছে জল। মহাসাগরের পরিধি ভূখণ্ডের আড়াই গুণ। স্থলচর প্রাণীর থেকে জলচর প্রাণীর জাত অন্ততঃ ৩০০ গুণ বেশী। যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে স্থলের থেকে জলের কদর বহু বেশী। পরিবেশের মধ্যে জলকে আমরা পাই তার 'তিন' অবস্থাতেই—কঠিন (০° সেণ্টিগ্রেডের নীচে গ্লেসিয়ার বা বরফ জমাট হ্রদ-নদী-সমুদ্রে), তরল (০° সেঃ থেকে ১০০° সেঃ পর্যন্ত জল হিসাবে) এবং গ্যাস (১০০° সেঃ-এর উপর বাষ্প বা জলকণারূপে)। এইসব কারণে পরিবেশ বিজ্ঞানে জলের অনুশীলন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

জলের অপর নাম জীবন, কারণ জল জীবনধারণের বৃহত্তম মাধ্যম। শুধু জীবন নয়, আর কোন পার্থিব তরল পদার্থে এতরকম জড় পদার্থ মিশে গলে যায় না, যা জলে সম্ভব। তাপ গ্রহণের ক্ষমতাও এর অসীম। জলের লীনতাপ (Latent Heat— ০° সেঃ তাপমাত্রার এক গ্রাম বরফকে ১ গ্রাম জলে পরিণত করতে বা ১০০° সেঃ ১ গ্রাম জলকে ১ গ্রাম বাষ্পে পরিণত করতে যে তাপের প্রয়োজন হয়) ০° সেঃ-এ ৮০ ক্যালরি এবং ১০০° সেঃ-এ ৫৪০ ক্যালরি। উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর এর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া খুবই বেশী। জলের পৃষ্ঠ-টান (Surface Tension) এবং সান্দ্রতা (Viscosity) খুব বেশী বলে জলচর উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলি সহজেই নানান প্রাকৃতিক ঝড়-ঝাপ্টা-দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। জলের আর এক বিশেষ গুণ তার স্বচ্ছতা। ক্ষুদ্র তরঙ্গযুক্ত শক্তি (যেমন অতি-বেগুনী রশ্মি) জলের ভিতর ২০০ মিটার পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। জলের এই গভীরতাকে বলা হয় আলোকময় স্তর (Photic Zone)। এর নীচের অংশের নাম আলোকহীন স্তর (Aphotic Zone)। জলের ঘনত্বের একটা বিশেষত্ব আছে। জল ৪° সেঃ সবচেয়ে গাঢ়, ঘন, ভারী। এর চেয়ে উপরের ও নীচের যে-কোন তাপমাত্রায় জল পাতলা ও হালকা। এর ফলে উপরের জল জমে বরফ হয়ে গেলেও তলদেশের জল ৪° সেঃ তরল অবস্থাতেই থেকে যায় ও জলচর প্রাণীরা তার মধ্যেই বেঁচে থাকতে পারে। জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকলে তাকে বলা হয় কঠিন (Hard)। এই রাসায়নিকগুলি বাইকার্বনেট যৌগ হিসাবে থাকলে, জল ফোটালেই তা দূরীভূত হয়। কিন্তু ক্লোরাইড, সালফেট প্রভৃতি যৌগ শুধু ফোটালেই দূরীভূত হয় না। এইজন্য বাইকার্বনেট যুক্ত

জলের কাঠিন্যকে অস্থায়ী ও অন্যান্য যৌগযুক্ত জলের কাঠিন্যকে স্থায়ী বলা হয়।

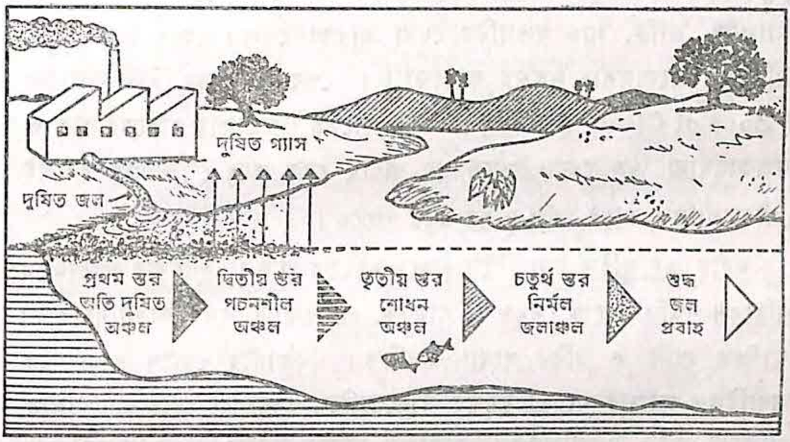
জল জীবনের পক্ষে কি পরিমাণ প্রয়োজনীয়, উপোসী মানুষের শরীরাবস্থা বিচার করলে তা সহজেই বোঝা যাবে। একজন অনশনকারীর শরীর থেকে মোট প্রোটিনের ৫০ শতাংশ, দেহের ওজনের ৪০ শতাংশ এবং সমস্ত গ্লাইকোজেন কমে গেলেও জীবনের পক্ষে কোন বিপদ দেখা দেয় না কিন্তু শরীরের মোট জলের ১০ শতাংশ ঘাটতি হলেই মৃত্যুর ছায়া পড়তে পারে।

জলাভূমিতে (৩ নং চিত্র) যে সব প্রাণী ও উদ্ভিদ থাকে, জলার স্বল্প গভীর জল শুকিয়ে গিয়ে তাদের বিপদ ঘটতে পারে। এইজন্য প্রকৃতি তাদের উভচর করে তৈরী করে। কিছু মাছ আছে যারা ভিজে ঘাসের মধ্যে ৬০ ঘন্টা বেঁচে থাকে। ব্যাং কাদায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে সেখানে ঘুমন্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিতে পারে দীর্ঘ খরা মরশুম। যে-কোন প্রাণীর পক্ষেই বাঁচার জন্য জল সংরক্ষণ অবশ্যম্ভাবী। কিছু পার্বত্য ছাগল খাবার থেকে পানীয় জল উশুল করে নেয়। মাংসাশী প্রাণীরা শিকারের রক্তে তৃষ্ণা মেটায়। মরু অঞ্চলের প্রাণিদেহের পরিপাক ক্রিয়া থেকে সংগ্রহ করে দেহের জলের চাহিদা। কিছু কিছু পশু-পাখীর চামড়া জল সংরক্ষণের উপযোগী নিশ্ছিদ্র। জল সংরক্ষণ করতে গিয়ে কিছু প্রাণী নিশাচর। কেউ কেউ বা খরাতে হয় দেশান্তরী। মোটমাট যেখানেই জলের ঘাটতির সম্ভাবনা আছে সেখানেই প্রকৃতি পরিবেশ সংরক্ষণের মারফৎ ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা পাকা করে রাখে।

দু ধরনের জলীয় পরিবেশ-পদ্ধতি হয়—**স্থির জল** (জলা, পুকুর, লেক বা হ্রদ) এবং **বহমান জল** (নালা, খাল, নদী, ঝরনা)। দুই পদ্ধতির উৎপাদক ও গ্রাহক আলাদা আলাদা জাতের। সম্ভবতঃ ২০,০০০ বছর আগে ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনে গঙ্গা উপত্যকায় বহমান (Lotic) জলের পথ নানা-স্থানে রুদ্ধ হয়ে জন্ম হয় অসংখ্য স্থির জলের (Lentic) হ্রদ বা জলাশয়। এর ফলে বিন্ধ্য উপত্যকা থেকে আগত শিকারজীবী মানুষ ও সহকারী পশুপাখীতে ভরে যায় উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকা। স্থির জলের সৃষ্টির সাথে সাথে জন্ম হল স্থির জলের উপযোগী নানান জলচর ও উভচর উদ্ভিদ ও প্রাণী। বিজ্ঞানীদের অনুমান এ বিবর্তন চলেছিল ১০০০ বছর ধরে।

প্রাচীন পলিমাটি-সমৃদ্ধ এইসব জলাশয়ের তীরে গড়ে উঠেছিল ছোট ছোট শিকারী ও মৎস্যজীবী সমাজ যেখানে এক-বিবাহের (Monogamy) ভিত্তিতে গড়ে উঠত পরিবার। পারিবারিক অগ্নিকুণ্ডে তারা কাঠের আগুনে ঝলসে খেত পাথুরে অস্ত্রে নিহত পশু, মাছ, কচ্ছপ। গাঙ্গেয় উপত্যকায় পরিবেশ দূষণের এখানেই আরম্ভ। সময়টা তখন মধ্য প্রস্তর-যুগ। স্থির জলের আলোচনার পর এবার বহমান জল। বহমান জল বা নদীর একটা প্রধান বিশেষত্ব এর নিজস্ব পরিশোধন ক্ষমতা। নদী তার দূষিত জলকে পরিশুদ্ধ করে ৫-টি উপায়ে[৪] :

(১) তরলায়ন : দূষিত জল ও নদীর বিপুল জলরাশির মিশ্রণে দূষণের পরিমাণ বা হার অনেক পাতলা (Dilution) হয়ে যায়।



নকশা নং-৭

(২) থিতানো : মোটা ও সূক্ষ্ম দূষিত পদার্থের কণা ক্রমে নদীর তলদেশে থিতিয়ে (Sedimentation) পড়ে ও জল দূষণমুক্ত হয়ে ওঠে।

(৩) জারণায়ন : দূষিতপদার্থের সঙ্গে জলের মধ্যেকার অক্সিজেন জারণ প্রক্রিয়া (Oxidation) মারফৎ অদ্রবণীয় বৃহদাকার কণাযুক্ত যৌগ তৈরি করে যা থিতিয়ে গিয়ে জলকে নির্মল করে তোলে।

(৪) অজারণায়ন : দূষিত জৈব পদার্থের অজারণ প্রথায় (Reduction) অক্সিজেনমুক্তি ঘটে ও দূষিত পদার্থ নবরূপে থিতিয়ে পড়ে।

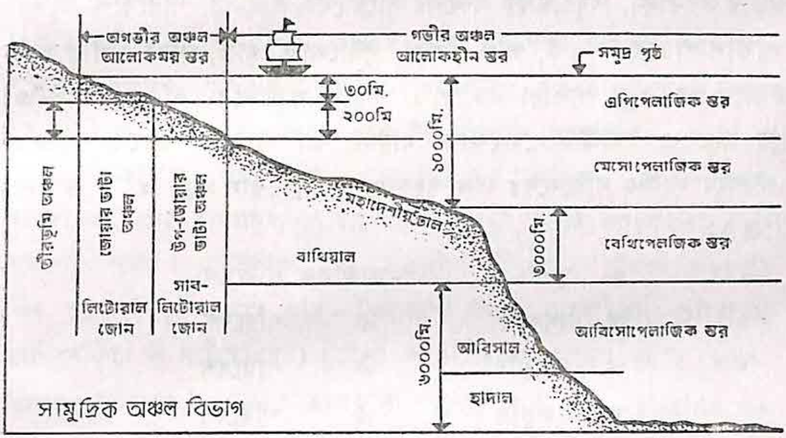
(৫) আলোক রসায়ন : সৌরালোকের অবলোহিত ও অতি-বেগুনী

অংশ জলের দূষণকারী জীবাণুদের মেরে ফেলে জলকে দূষণমুক্ত করে। ৭ নং নকশায় দেখুন পাড় বেয়ে দূষিত জল এসে পড়ছে নদীর অতি-দূষিত অঞ্চলে (Zone of Degradation)। জলের চেহারা এখানে ঘোলাটে। গুল্ম, ছত্রাক, শৈবাল কিছুই নেই প্রায়। জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড মাত্রা-তিরিক্ত, পানের বা ক্ষেত্রবিশেষে স্নানেরও অযোগ্য। এর পরে এল পচনশীল অঞ্চল (Zone of Decomposition)। অবায়ুজীবী জীবাণুর সাহায্যে যে পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয় তার ফলস্বরূপ মিথেন জাতীয় দূষিত গ্যাস বেরিয়ে আসে জল থেকে। জলের রং এখানেও ধূসর বর্ণ। জলে অক্সিজেনের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে। মৎস্য জাতীয় প্রাণীর দেখা না পেলেও জলজ পোকা-মাকড়ের দেখা পাওয়া যায়। তৃতীয় স্তর শোধনাঞ্চল (Zone of Recovery)। এখানেই প্রথম প্রটোজোয়া অ্যালজি, ফাঙ্গি, মাছ ইত্যাদির দেখা পাওয়া গেল। জল প্রায় স্বচ্ছ, অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মানের কাছাকাছি। শেষ স্তর হচ্ছে নির্মল জলাঞ্চল (Zone of Clear Water)। তবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় মানুষের বাস ও কলকারখানা এত বেড়ে গেছে যে প্রবাহ শেষ স্তরে পৌঁছাবার আগেই পৌনঃপৌনিক ভাবে অতি-দূষিত হয়ে পড়ছে।

নদীর এই দূষিত জল গিয়ে পড়ছে সমুদ্রের বুকে। পৃথিবীর প্রাচীনতম পরিবেশ-পদ্ধতি হচ্ছে সমুদ্র (আয়তন ২৯ কোটি বর্গ কিলোমিটার)। আশ্রিত প্রাণী ও উদ্ভিদ সংখ্যা অগণিত। বিজ্ঞানীর চোখে সমুদ্র এক অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার যা ভবিষ্যতের জীবগোষ্ঠিকে জোগাবে আহার, পানীয়, জ্বালানী, হয়ত-বা আশ্রয়ও। ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদের সামুদ্রিক-সম্পদ-শাখার মতে সমুদ্রকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে সেখান থেকে পাওয়া লক্ষ লক্ষ টন মাছ, মাংস, তেল, সামুদ্রিক খাদ্য, খনিজ (তামা, দস্তা, ম্যাংগানিজ, নিকেল, লোহা, রূপো, সোনা) ধাতু, মণিমুক্তা ও শেষমেশ জলশক্তি আমাদের অর্থনীতিকে বহু গুণ উজ্জ্বলতর করে তুলতে পারে। তাই সমুদ্র বিদ্যার (Oceanography) চর্চা এক নবতর গুরুত্ব পেয়েছে।

আমরা এখানে অবশ্য আবিষ্কারক বা সম্পদ সঞ্চয়কারীর নয়, নেহাৎই পরিবেশ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুশীলন করব সমুদ্র বিদ্যার। বোঝবার সুবিধার জন্য সমুদ্রকে ভাগ করা হয়েছে কতকগুলি স্তরে (৮ নং নকশা)।

যেমন গভীরতা অনুযায়ী দুটি প্রধান ভাগ—**অগভীর** (Neritic) ও **গভীর** (Oceanic) **অঞ্চল**। অগভীর অঞ্চল বলতে বোঝায় তীরবর্তী ২০০ মিটারের কম গভীর অঞ্চল। এখানে জলের মধ্যে প্রচুর সূর্যালোক আসে। ফলে উৎপাদক উদ্ভিদ ও গ্রাহক প্রাণী সংখ্যায় বিপুল। অগভীর সমুদ্রাঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চল (Inter-tidal Zone) এবং, (২) উপ-জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চল (Sub-tidal Zone)। প্রথমটি ৩০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। অগভীর



নকশা নং-৮

অঞ্চলে প্রচুর সৌরালোক আসে বলে একে বলা হয় ফোটিক স্তর। মাটির ঢাল কম বলে এখানে নদী-নালা বাহিত আবর্জনাও বেশী। কম ঢালের দরুন এর অপর নাম মহাদেশীয় তাক (Continental Shelf)। জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চল ও উপ-জোয়ার-ভাঁটা অঞ্চলের অপর নাম যথাক্রমে লিটোরাল ও সাব-লিটোরাল স্তর। পরবর্তী অংশ গভীর অঞ্চলের ১০০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অংশকে বলা হয় মহাদেশীয় ঢাল (Continental Slope)। গভীরতা হিসাবে গভীর অঞ্চলকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. এপিপেলাজিক স্তর (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিঃ)
খ. মেসোপেলাজিক „ (২০০ মিঃ থেকে ১,০০০ মিঃ)
গ. বেথিপেলাজিক „ (১০০০ মিঃ থেকে ৪,০০০ মিঃ)
ঘ. অ্যাবিসোপেলাজিক „ (৪,০০০ মিঃ থেকে ১০,০০০ মিঃ)

এই চারটি স্তরে আলো পৌঁছায় না বলে এগুলি আলোকহীন বা আফোটিক স্তর[৫]।

জল পরিবেশের আলোচনা শেষ করে আমরা আর এক দফা ফিরে যাবো **স্থল পরিবেশে।** কারণ উভয় পরিবেশের কিছু তুলনামূলক আলোচনা বাকি রয়ে গেছে। জল পরিবেশে পরিবর্তন বড় একটা হয় না। হলেও তা খুব ধীরে ধীরে হয়—লক্ষণীয় মাত্রায় বা গতিতে নয়। স্থল পরিবেশে কিন্তু ভেদাভেদ খুব বেশী—স্থান, কাল, অঞ্চল-ভেদে। পর্বত শিখরের সাথে গভীর উপত্যকা, বিষুবরেখীয় অঞ্চলের সাথে মেরু অঞ্চলের, পরিবেশে প্রভেদ আকাশ-পাতাল। বৃষ্টি, তাপ, শৈত্য, সূর্যালোক, মাটি, জমির জলীয় ভাগ ইত্যাদি সব কিছুই আলাদা আলাদা। তাছাড়া ঋতুভেদে এগুলির পরিবর্তনও খুব দ্রুত ও স্পষ্ট। যে-কোন মানুষই তা উপলব্ধি করতে পারে। এইভাবে পার্থিব পরিবেশের এক সহজতর শ্রেণীবিন্যাস সম্ভব (২, ৩ ও ৪নং চিত্র):

ক. তুন্দ্রা	উপ-আঞ্চলিক	পরিবেশ
খ. বনভূমি	ঐ	পরিবেশ
গ. তৃণভূমি	ঐ	পরিবেশ
ঘ. মরুভূমি	ঐ	পরিবেশ

তুন্দ্রা ও মরুর অতি কর্কশ পরিবেশে জীবনের বিকাশ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ক্রান্তীয় পরিমণ্ডলের বনভূমি বা তৃণভূমিতে পরিবেশ জীবনের বিকাশের পক্ষে এত অনুকূল যে এই সব এলাকায় প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির যেন এক প্রতিযোগিতা লেগে থাকে। যে সব বিষয় বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য ও পরিবর্তন সূচনা করে সেগুলি হল:

(১) মাটির আর্দ্রতা: পার্থিব প্রাণী ও উদ্ভিদের বিকাশে আর্দ্রতার এক বিশেষ স্থান আছে। জলাভাবে প্রাণের যত বিকাশ স্তব্ধ হয়, খাদ্যাভাবে তার এক শতাংশও নয়।

(২) তাপ: স্থলভাগে স্থান ও কাল-ভেদে তাপমাত্রার সুগভীর পরিবর্তন হয়। ভূচর প্রাণী ও উদ্ভিদের তাই বিভিন্ন তাপমাত্রায় সহনশীল হতে হয়।

(৩) অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড—বাতাসে এই দুই গ্যাসের মাত্রা একেবারে নির্দিষ্ট। অক্সিজেন ২১%, কার্বন ডাই-অক্সাইড ০·০৩%। এর নড়চড় হলে ফল জীবজগতের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

(৪) আলো : স্থান, কাল-ভেদে সৌরালোকের মাত্রা কম-বেশী হয়। যেহেতু যে-কোন পরিবেশে শক্তি অর্জনের প্রধান সূত্র সূর্যরশ্মি; পার্থিব জীবনের আকার-আকৃতি সবই সূর্যালোকের উপর বেশ খানিকটা নির্ভরশীল।

এইসব বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে কিভাবে গড়ে ওঠে এক একটি পরিবেশ, এবার তাই পরীক্ষা করা যাক।

ক. **তুন্দ্রা** উপ-অঞ্চল : ফিন শব্দ 'তুনতুরি' মানে বৃক্ষহীন সমতল। তার থেকে এসেছে তুন্দ্রা কথাটি। গভীর শৈত্য (−২১° সেঃ অব্দি), নিত্যতুষারাচ্ছন্নতা, জলহীনতা, অনুর্বর ভূমি, প্রাণের অপ্রাচুর্য এই উপ-অঞ্চলের লক্ষণ। পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল (গ্রীনল্যাণ্ড, সাইবেরিয়া, মেরু অঞ্চল ইত্যাদি) ও অন্যত্র পর্বত শিখরে এই উপ-অঞ্চলের প্রসারণ।

খ. **বনভূমি** উপ-অঞ্চল (২নং চিত্র) : আর্দ্রতা, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া, প্রাণের প্রাচুর্য, সৌরালোকের প্রাচুর্য, বৃষ্টির প্রাচুর্য এই উপ-অঞ্চলের লক্ষণ। আবহাওয়া ও ভূতাত্ত্বিক বিন্যাসের পার্থক্য অনুযায়ী তিন রকম বনভূমি দেখা যায়—উত্তরের (উত্তর আমেরিকা, ক্যানাডা, স্কাণ্ডিনেভিয়া ও সাইবেরিয়া) ছুঁচলো পাতাওয়ালা গাছের বন (Coniferous Forest), চওড়া পাতাওয়ালা পর্ণমোচী বৃক্ষের বন (Deciduous Forest) এবং ক্রান্তীমণ্ডলীয় বর্ষা-সমৃদ্ধ বন বা জঙ্গল (Tropical Rain Forest or Jungle)।

ভারতে সাড়ে সাত কোটি হেক্টর বনভূমি দেশের মোট জমির ২২·৭ শতাংশ অধিকার করে আছে। এর মধ্যে রয়েছে হিমালয়ের আলপাইন ও সাব-আলপাইন বন যা মূলতঃ কনিফেরাস। এর মধ্যে রয়েছে রডডেনড্রন, জুনিপার, ভূর্জপত্র বেটুলা, রূপালী ফার (২৯০০ মিঃ-৩৮০০ মিঃ উচ্চতায়), দেওদার, পাইন, প্রুস, ওক (১৮০০ মিঃ-২৮০০ মিঃ উচ্চতায়)। পশ্চিমবাংলার শৈলশিরা দার্জিলিং জেলায় বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় সেখানে কনিফেরাস বনের থেকে চওড়া পাতা পর্ণমোচীর (হেমলক, ম্যাপল, ইউ, চিরপাইন, লরেল ও কিছু ওক) সংখ্যাই বেশী। ৭৫০ মিঃ-১৮০০ মিঃ উচ্চতায় (বিশেষতঃ আসাম ও দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে) বননাশের ব্যাপকতা বড় বেশী। পার্বত্য উপজাতির লোকেরা এইসব অঞ্চলে বনভূমি কেটে 'ঝুম' পদ্ধতিতে চাষ করেন চা, রবার, কফি। ঝুম পদ্ধতির নিয়ম : কোন একটি জমিতে কয়েক বছর চাষ করার পর সেখানে বনভূমি গজিয়ে উঠতে দিয়ে

চাষ তুলে নিয়ে যাওয়া হয় অন্য জমিতে। এইভাবে জমি বদলে বদলে ওই জমিতে ফিরে আসা হয় ২৫/৩০ বছর বাদে। এতে বন সংরক্ষণ ও ভূমি সংরক্ষণ দুই হয়। কিন্তু চাষের জমির চাহিদা ইদানীং বেড়ে যাওয়ায় কোন জমিতেই বনভূমি হতে এত সময় ফেলে রাখা হয় না—ফলে 'ঝুমের' মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে। বননাশ ও ভূমিনাশ দুই চলেছে সমানে। দেশের মোট বনভূমির অর্ধেক (৩৩ কোটি হেক্টর) ক্রান্তীয় জঙ্গল (পশ্চিমঘাট পর্বতমালার চিরহরিৎ



নকশা নং-৯

বন যা ছড়িয়ে আছে কর্ণাটক, কেরালা ও আন্দামান পর্যন্ত ; দক্ষিণের মিশ্র জঙ্গল যাতে চিরহরিতের সঙ্গে মিশে গেছে অর্জুন, দেশী বাদাম ইত্যাদি ; উত্তরের মিশ্র জঙ্গল যাতে চিরহরিতের সাথে মিশেছে ঝুম পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা বাঁশবন এবং সর্বশেষ সমতলের পর্ণমোচী জঙ্গল (শাল, সেগুন, তেঁতুল, চন্দন, বাঁশ, সামান্য কিছু আম ও সুন্দরী)। এই হল ভারতের বনসম্পদের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র (৯নং নকশা)।

গ. তৃণভূমি উপ-অঞ্চল (৩নং চিত্র)—যেখানে বৃষ্টিপাত মরু অঞ্চল থেকে বেশী অথচ বনভূমি সৃষ্টি করার মত পর্যাপ্ত নয় সেখানে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে তৃণভূমি যা মানুষ এতদিন কাজে লাগিয়েছে চারণক্ষেত্র হিসাবে। কিন্তু এখন খাদ্য চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে পরিবাহিত জলসেচের ব্যবস্থা করে মানুষ ক্রমে এগুলিকে পরিণত করছে কৃষিক্ষেত্রে। একে আপাতদৃষ্টিতে

কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বলে মনে হলেও এতে চারণভূমির গ্রাহকদের খাদ্যে অনটন দেখা দেবে, টালমাটাল হবে পরিবেশের ভারসাম্য। ভারতে তৃণভূমি দেখতে পাওয়া যায় নীলগিরিতে।

ঘ. **মরু** উপ-অঞ্চল (৪নং চিত্র)—পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ ছেয়ে আছে মরুভূমি যার প্রধান লক্ষণ জলাভাব (বৃষ্টিপাত বছরে ৫-২৫ সেন্টিমিটার), ধূলিঝড় এবং মাটিতে বালির আধিক্য। দু জাতের মরুভূমি দেখা যায়—তপ্ত (ক্রান্তিমণ্ডলীয় মরু) ও ঠাণ্ডা (উত্তরাঞ্চলের মরু)। সম্প্রতি সাহারা মরুভূমিতে ব্যাপকভাবে সেচখালের সাহায্যে কৃষিকার্য করার এক



নকশা নং-৯ (ক)

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা তৈরী করা হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা কিন্তু আশঙ্কা করছেন এতে উত্তপ্ত সাহারা অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও তাপ হ্রাসের ফলে বিশ্বের আবহ পরিবেশে এক তুলকালাম ওলটপালট হবে, যার ফলে পৃথিবীতে বরফ যুগের আগমন ত্বরান্বিত হওয়াও অসম্ভব নয়। আবহ পরিবেশ অবশ্য আমাদের পরের অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। তবে এ অধ্যায় শেষ করার আগে ভূ-পরিবেশের আর একটি দিক—যা এতদিন প্রায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আড়ালেই রয়ে গেছে, সে বিষয়ে একটা প্রাথমিক আলোচনা করে নেওয়া উচিত।

এটা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড স্থায়ী চুম্বক। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীটা একটা চুম্বক বলেই সব চুম্বকের চুম্বকধর্ম প্রকাশ পায়

(যথা, বাধাহীনভাবে টাঙ্গিয়ে রাখলে তা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত চুম্বক কক্ষের সমান্তরাল হয়ে ঝুলবে—যে ধর্ম থেকে কম্পাসের জন্ম)। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক সমুদ্র শৈবালের সন্ধান পেয়েছেন যা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এই প্রভাবে এরা ভেসে চলে একটি বিশেষ দিকে, নির্দিষ্ট পথে। বিজ্ঞানীরা এও দেখেছেন যে মানুষের শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মেও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাব খুব সূক্ষ্ম ও জটিলভাবে বর্তমান। হিন্দুসমাজে দক্ষিণ শিয়রে শয়ন নিষিদ্ধ। তার পিছনেও হয়ত কারণ হিসেবে বর্তমান পার্থিব চুম্বক ধর্ম। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন শরীরের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম ও সেই-সঙ্গে বিভিন্ন রসের নিঃসরণ পার্থিব চৌম্বকশক্তির দ্বারা সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত। পায়রা, মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর রহস্যজনক চুম্বকপ্রবণতাও তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। ব্রাজিলের অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেলের মতে ভূ-গোলকের যেসব অঞ্চলে পার্থিব চুম্বকত্ব শক্তিশালী সেখানে নির্দিষ্ট জাতির জীবাণু খুব দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করে, বিশেষতঃ অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে। অর্থাৎ, এক কথায় শুধু জড়ধাতু নয়, চুম্বকশক্তি জীবজগতেও তার প্রভাব খাটায়।

প্রাচীনকালের বিশ্বাসমতে পৃথিবীর উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর মধ্যে যে চুম্বকস্রোত বয়ে চলেছে তার সঙ্গে ঘুমন্ত ব্যক্তির দেহ এক সরলরেখায় থাকলে. স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। উড়ন্ত পায়রা দিক-নির্ণয় করে ভূ-চুম্বকের সাহায্যে। অ্যামিবা, মাছি, গুব্‌রে পোকা এবং শামুকও চৌম্বকক্ষেত্রের মাঝে কি যেন সন্ধান করে ফেরে—খুব সম্ভবতঃ এই শক্তির উৎস। মাছ ও মুরগীর ডিম থেকে ছানার বিবর্তন চুম্বকের দ্বারা ধীরগতি ও স্তিমিত করা যায়। আবার চুম্বকের সাহায্যেই গাছের শিকড় ও অঙ্কুরের বৃদ্ধিকে করা যায় ত্বরান্বিত। পাতার সালোক-সংশ্লেষের তীব্রতা ও বীজের উপর তাপের ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে ফেলা যায়। কৃত্রিম চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করলে তার মধ্যে টম্যাটো তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাড়াতাড়ি পাকে। আগের পাতায় যে সামুদ্রিক জীবাণুর কথা বলা হয়েছে, হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এদের ভ্রমণপথে বিপরীতমুখী কৃত্রিম চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেখেছেন এদের গতিমুখ পাল্টে গেছে। উল্লেখ্য, এই জাতের জীবাণুর দেহে লোহার পরিমাণ অন্যান্য জীবাণুর তুলনায় ১০ গুণ বেশী। হয়ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে লোহার মাত্রা কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চুম্বক প্রয়োগে তাদের বৃদ্ধি, রোগমুক্তি, প্রজনন ও মৃত্যু প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কোন ক্ষতিকর রাসায়নিক

প্রয়োগ না করেই। চীনে জুতোর মধ্যে এক সেন্টিমিটার মাপের ২ বা ৪টি চুম্বক বসিয়ে, সেই চুম্বক জুতোর সাহায্যে চিকিৎসা করা হচ্ছে রক্তের উচ্চচাপ, স্নায়ু বিকলতা, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগের। পরীক্ষা নাকি খুবই সফল। ২য় মহাযুদ্ধের সময়ও অঙ্গচ্ছেদন, নেফ্রাইটিস, হার্টের অসুখের চিকিৎসাও চুম্বকের সাহায্যে হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন পোলিয়ো, পার্কিন্সন রোগ, আর্থারাইটিস ও স্পণ্ডিলাইটিসের রোগীরা।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর চুম্বকের প্রভাব সুদূর-প্রসারী। তা যদি হয় পরিবেশ সংরক্ষণেও তাকে কাজে লাগাতে আপত্তি কোথায়?

এখনো অরণ্য শুধু,
প্রচণ্ড প্রপাত সদা গর্জমান।
কুয়াশার ওড়নায় এই ঢেকে এই খুলে মুখ,
অসংখ্য অবাক ফুল
মৃদু হেসে ছড়ায় কুহক।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

এই হাসির কুহকটুকুকে যে ভাবেই হোক সংরক্ষণ করতেই হবে।

---

১. তারকমোহন দাস/কোটপাল ও বালি ২. ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স ৩. কোটপাল ও বালি ৪. ও ৫. সলিল লাহিড়ী/কোটপাল ও বালি।

আকাশ আর বাতাস মানবককে টেনেছে যুগে যুগে। আড়াই হাজার বছরের পুরানো মিশরীয় চিত্রলিপিতে রয়েছে ঘুড়ি ওড়ানোর সাক্ষী সমসাময়িক গ্রীসে এথেন্সের বিজ্ঞানী আর্চিটাস বায়ু প্রবাহের খুঁটিনাটি শিখবার জন্য পাখীর ডানার মডেলে বানিয়েছিলেন ঘুড়ি। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফাঙ্কলিন মেঘের মাঝে আবিষ্কার করেছেন বিদ্যুৎ। ইতিমধ্যে মানুষ বাতাসকে কাজে লাগিয়ে চালিয়েছে পাল তোলা জাহাজ, উইণ্ড মিল, আকাশগামী বেলুন। বুয়োর যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বেডেন পাওয়েল শুরু করলেন আর এক ধুরন্ধরী-ঘুড়ি আর বেলুনের সাহায্যে আকাশ

থেকে শত্রু শিবিরের উপর গুপ্তচরবৃত্তি। ইন্দ্রের পুষ্পক রথ বাদ দিলে সেদিনই শুরু হল আকাশ যুদ্ধ যা আজও চলেছে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে। হিরোসিমা ও নাগাসাকির কুকীর্তিও মানবক ঘটিয়েছে আকাশপথেই। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল স্থাপন করেন এরিয়াল এক্সপেরিমেণ্ট অ্যাসোসিয়েশন যাঁরা পরবর্তীকালে বিমান-চালন বিদ্যার মূল হোতা। এই সঙ্গে গ্লাইডার চালনা দিয়ে শুরু করেন বিশ্ববিখ্যাত বৈমানিক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। ঘুড়ির সাহায্যেই তৈরী হয় নায়গ্রাপ্রপাতের উপর দিয়ে ঝোলানো সাসপেনশন ব্রীজ। আকাশ থেকে নকল বৃষ্টি নামানো ও মানবকের খ-বিদ্যার এক কীর্তি।

প্রথম অধ্যায়ের ৩ নং নকশায় দেখুন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১২ কিলোমিটার অবধি ব্যাপ্ত আমাদের বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ার (ক্ষুব্ধমণ্ডল বা **নিম্নাকাশ**)। তার উপর ৬০ কিলোমিটার পুরু স্ট্রেটোস্ফিয়ার (শান্তমণ্ডল বা **মধ্যাকাশ**)। এখানেই আমাদের ভৌগোলিক আকাশের সীমানা শেষ যার পর শুরু হবে মেসোস্ফিয়ার বা মহাকাশের সীমানা[১]। বায়ুমণ্ডল না থাকলে শুধু যে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতাম, তাই নয়, আমাদের মৃতদেহগুলিও সে রাত্রের মত জমা বরফের ঠাণ্ডায় পচনের হাত থেকে রক্ষা করে পরের দিন সূর্যোদয় হলে সৌরতাপে দাহ করে ছাই করে দিত প্রকৃতি নিজেই। অর্থাৎ রাত্রে ভূ-পৃষ্ঠের তাপকে ভূ-পৃষ্ঠেই আটকে রেখে তাকে মাত্রাতিরিক্ত ঠাণ্ডা হতে দেয় না বায়ুমণ্ডল। আবার দিনে সূর্যের তাপের বড় অংশকে ঊর্ধ্বাকাশে আটকে দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠকে মাত্রাতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করে এই বায়ুমণ্ডলই। শুধু তাই নয়, সূর্য ও মহাকাশ থেকে যেসব ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে বায়ুমণ্ডল যদি তা নিঃশেষে শুষে না নিত তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ হয়ে উঠত অসম্ভব, অন্ততঃ স্থলচর প্রাণের তো বটেই।

মহাকাশ থেকে প্রায়শঃই উল্কাপিণ্ড পার্থিব মাধ্যাকর্ষণে ঢুকে পড়ে আমাদের আকাশ সীমানায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের সাথে ঘর্ষণের ফলে তাদের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে আগুন জ্বলে ওঠে ও আকাশেই সেগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বায়ুমণ্ডল না থাকলে উল্কাপিণ্ডগুলি অক্ষত শরীরে ঝাঁপিয়ে পড়ত পৃথিবীর বুকে এবং রেলগাড়ীর মুখোমুখি ধাক্কা লাগার মত প্রতিদিন প্রতি মূহূর্তে শতসহস্র ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেত ভূ-পৃষ্ঠে যার শিকার হত কোটি কোটি টাকার ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা, ক্ষেত খামার এবং শতসহস্র প্রাণ। বায়ুবাহী ধূলিকণায় সৌরালোক প্রতিফলিত হয়ে আকাশের রং হয়েছে উজ্জ্বল নীল। বায়ু না থাকলে ধূলিও থাকত না। বায়ুমণ্ডলের বাইরে দাঁড়িয়ে আকাশকে যেমন ঘন কালো দেখায়, পৃথিবী থেকেও ঠিক সেই রকমই দেখাত।

অতি-বেগুনী রশ্মির প্রায় সবটাই মধ্যাকাশের বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। লাল উজানী আলো ও তাপ রশ্মির বেশীর ভাগটাই শোষিত হয় নিম্নাকাশের

বায়ুমণ্ডলে। কসমিক বা মহাজাগতিক রশ্মির অতি শক্তিশালী তরঙ্গমালা বায়বীয় সংঘর্ষে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শব্দ তরঙ্গের বাহক হচ্ছে বাতাস। হাওয়া না থাকলে শব্দ জগতও হাওয়া হয়ে যেত আমাদের কান থেকে। শ্রবণাতীত হয়ে যেত আমাদের সব সঙ্গীত, সব ভাষণ। অবশ্য এসবের প্রশ্ন উঠতই না ; অনেক আগে বায়ুশূন্য চাপহীন অবস্থায় দেহের আভ্যন্তরীণ চাপে আমাদের প্রত্যেকের শরীরই বেলুনের মত ফুলে গিয়ে ফেটে যেত।

না থাকলে কি হত এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যখন আছে, আসুন অনুশীলন করা যাক বাতাসের গঠনতন্ত্র-কার্য-কারণ ইত্যাদি নিয়ে। বাতাস আসলে মৌলিক কিছু নয়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলকণা, ধূলিকণা প্রভৃতির সাধারণ মিশ্রণ (Mechanical Mixture) মাত্র। এই মিশ্রিত বায়বীয় সমহারের অণুগুলিকেই আমরা বাতাসের কণিকা বলি। ভূ-পৃষ্ঠে (যেখানে বাতাস সবচেয়ে বেশী ঘনীভূত) এক ঘন সেন্টিমিটার বাতাসে ৩১,৩৬০ কোটি বায়ুকণা রয়েছে। প্রতি নিঃশ্বাসে একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ গ্রহণ করছে এইরকম ১ কোটি কোটি অর্থাৎ ১০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ বায়ু কণিকা (কোটিপতি হতে আমাদের আটকাবে কে ?) !

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ ট্রপোস্ফিয়ারের ভিতর ৭৫ ভাগ বাতাসকেই ঘনীভূত করে রেখেছে। যে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহে অভিকর্ষের টান কম তাদের পক্ষে বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখা সম্ভব নয়, যেমন বুধ ও চাঁদ। বায়ুমণ্ডল নেই বলে এইসব গ্রহ-উপগ্রহে জীবন বিকাশেরও সম্ভাবনা নেই ; অন্ততঃ পার্থিব ধরনের জীবন। আর এই কারণেই এখানে নেই জল বলে কোন বস্তু। পৃথিবীর নিম্নাকাশের বায়ুমণ্ডলে **উপাদান** হিসেবে রয়েছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন (এই দুই উপাদানই দখল করে আছে বাতাসের ৯৯ ভাগ), আর্গন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ওজন প্রভৃতি গ্যাস, জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা। সমগ্র আকাশের মোট জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ১৭,০০,০০০ কোটি টন। বাতাসে অতি সামান্য পরিমাণে আছে নিয়ন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, মিথেন ও ক্রীপটন গ্যাস। বাতাসে যত দূষিত পদার্থ থাকে তার ৩০% হল ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা। ভারতে ভাসমান ধূলিকণার ভাগ সবচেয়ে বেশী—৪০%। এর মধ্যে শহর এলাকায় ধুলোর উপদ্রব আরো বেশী—হাওড়া ও কোলকাতার বাতাসের ৪৪% দখল করে রয়েছে ধূলিকণা[২]।

দুই শহরে প্রতিদিন ৫৬০ টন কারখানার ঝুলকালি, উনুন ও মোটরগাড়ীর ধোঁয়া, আবর্জনা ও বালি, মাটির গুঁড়ো, সিমেন্ট বাতাসে এসে মিশছে যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সিলিকন, কার্বন, ক্যালসিয়াম, সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন এবং কিছু বিষাক্ত ধাতুকণা (যেমন দস্তা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যাডমিয়াম, মলিবডেনাম এবং পেট্রোলের ধোঁয়াজাত সীসা)। এছাড়া ভাসমান জৈব পদার্থের মধ্যে থাকে উদ্ভিদের স্পোর, পরাগরেণু, ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, মাইসেলিয়াম ও ও অ্যাসবেস্টস ফাইবার।

নিরক্ষ অঞ্চলে ১৬ কিলোমিটার ও মেরু অঞ্চলে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাস স্তর ট্রপোস্ফিয়ারের অন্তর্গত (ছবিতে যার গড় মাপ দেখানো হয়েছে ১২ কিলোমিটার)। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হল উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বাতাসের উষ্ণতা কমতে কমতে ৪০° সেঃ পর্যন্ত নেবে যাওয়া। এই ট্রপোস্ফিয়ার বা নিম্নাকাশের বায়ুমণ্ডলই হ'ল মানুষ ও পশুপাখী-সহ সমস্ত জীবজগতের বিচরণক্ষেত্র। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘের ওড়াওড়ি সবই এই স্তরেই ঘটে। সূর্য থেকে পৃথিবী যে তাপ গ্রহণ করে সেই তাপই নিম্নাকাশের বাতাসকে তপ্ত করে রাখে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরিত তাপ ভূ-সংলগ্ন বাতাসকে উত্তপ্ত করে। গরম প্রসারিত হালকা বাতাস পরিচলনের মাধ্যমে ওই তাপকে উপরের দিকে প্রবাহিত করে (৪ নং নকশা)। এই তাপ পরিচলনের ফলে নিম্নাকাশের বাতাস সর্বদাই চলমান, বহমান। হয় উঠছে, নয় নামছে। গতি প্রায় শূন্য থেকে ঘণ্টায় ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত (মৃদু সমীরণ থেকে বিধ্বংসী হারিকেন টর্নাডো বা টাইফুন—গতি অনুযায়ী নানা নাম বায়ুপ্রবাহের)।

পৃথিবী কর্তৃক বিকিরিত তাপের প্রায় সবটাই ভূ-সংলগ্ন বাতাস শোষণ করে নেয়। জলীয় বাষ্পের মাধ্যমেও তাপ খুব একটা উঁচুতে পৌঁছাতে পারে না, তার আগেই জমে জল হয়ে যায়। তাছাড়া অবলোহিত ও অতি-বেগুনী অংশও এই স্তর অবধি পৌঁছাতে পারে না। উচ্চাকাশের বাতাসের হালকা উপাদানের অণুগুলি এই সব রশ্মি গ্রহণান্তে পরমাণুতে ভেঙ্গে যায়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩০০ ও ৮০০ কিলোমিটারের মধ্যে পারমাণবিক অক্সিজেন হল বাতাসের অন্যতম মুখ্য উপাদান। এ ছাড়া গৌণ উপাদান হিসেবে থাকে বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ওজন যারা বাতাসের তাপকে

নিম্নাকাশে আটকে রাখতে সহায়তা করে। এই সব কারণে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে নিম্নাকাশের বায়ুস্তরের তাপমাত্রা কমতে থাকে।

ট্রপোস্ফিয়ার (নিম্নাকাশ) ও তার উপরের স্ট্রেটোস্ফিয়ার (মধ্যাকাশ) —এই দুইয়ের সংযোগ স্থলে রয়েছে একটা বিরতি স্তর যার নাম ট্রপোপোস। এই স্তর খুবই স্থিতিশীল (তাই একে বলা হয় বিরতি স্তর বা রেপোস)। সাধারণভাবে আবহাওয়া বলতে আমরা যা বুঝি তা এই স্তরে একেবারেই অনুপস্থিত। তাপ পরিচলনের দরুন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঠে-আসা বাতাস এই অবধি উঠে আসতে পারে না ; তবে ট্রপোপোস স্তরে তার নিজস্ব শক্তিশালী বায়ুপ্রবাহ আছে যার নাম জেট স্ট্রীম। মহাজাগতিক কারণে এই প্রবাহের গতি ঘন্টায় ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

এর উপরের আকাশ—মেসোস্ফিয়ার বা থার্মস্ফিয়ারের সাথে পৃথিবীর পরিবেশগত সম্বন্ধ বিশেষ কিছু নেই কাজেই তাদের পরিচিতি বা বিবরণ এখানে উহ্যই রইল।

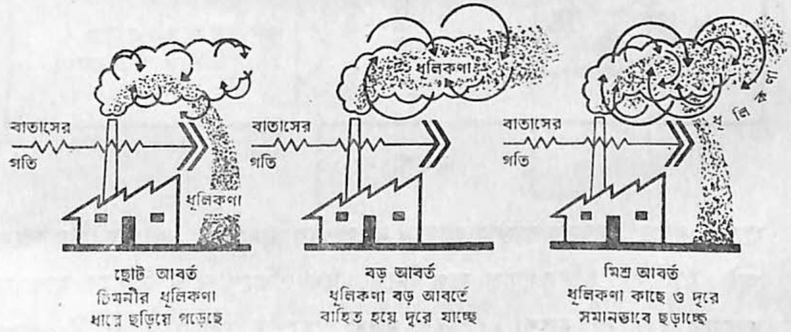
সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজন ৫৩,০০,০০,০০০ (৫৩ কোটি) টন। তবে পৃথিবীর ওজন পৌনে ৬ কোটি কোটি টন। সে তুলনায় বাতাসের ওজন নেহাৎই নগণ্য। এর কারণ পৃথিবীর গড় ঘনত্বের তুলনায় বাতাসের ঘনত্ব ১০,০০০ ভাগের ১ ভাগ। সমুদ্রপৃষ্ঠের বাতাসের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী—১ঘন মিটারে প্রায় ১·৩ কেজি মত তার ওজন। লম্বা চওড়া ও খাড়াইয়ে ৯ মিটার মাপের একটা ঘরে সমুদ্রপৃষ্ঠের স্বাভাবিক চাপে যতটা বাতাস ধরবে তার ওজন হবে ১ টনের মত। বায়ুমণ্ডলের ওজন ৫৩ কোটি টন—তবে 'বাতাসের মত হালকা' প্রবাদটা মিথ্যে নয়। কারণ সামগ্রিক ভাবে ওজন যাই হোক, বাতাসের ঘনত্ব খুবই কম। বাতাসকে যদি লোহার ঘনত্বে সংকোচিত করা সম্ভব হত, তা হলে সেই বায়ু যা পৃথিবীকে বেষ্টন করে রয়েছে কম বেশী—৬০০০ কিলোমিটার পুরু স্তরে তা পৃথিবীকে বেষ্টন করত মাত্র সওয়া মিটার (১·২৪৪৯ মিটার) পুরু লৌহবর্মে! বায়ুমণ্ডল বেশ ওজনদার হলেও তার অতি-মিহি ঘনত্ব আপাতদৃষ্টিতে তাকে 'হাওয়ার মত হালকা' করে তুলেছে।

সর্বাত্মক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হলে মাটি, জল এবং বায়ু—এই তিন মাধ্যমেরই শুদ্ধতা ও নির্মলতার কথা পাশাপাশি ভাবতেই হবে। আমরা মাটি ও জলের আলোচনা শেষ করে এসেছি। এবারের পালা বায়ু দূষণের।

বায়ু দূষণকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) স্বাভাবিক দূষণ—অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে যে দূষণ হচ্ছে। একে কমান-বাড়ানো যায় না। এই জাতীয় দূষণ তার নির্দিষ্ট হারে হবেই হবে। (২) কৃত্রিম দূষণ—বৈজ্ঞানিক, শৈল্পিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য নানান ভাবে বাতাস দূষিত হচ্ছে,—যথা কলকারখানার ঝুল-কালি, পরিত্যক্ত গ্যাস, মোটর গাড়ী ও নানান পেট্রোল ইঞ্জিনের ধোঁয়া ও আধপোড়া কার্বন, রেলগাড়ীর ছাই ও কয়লার গুড়ো, ধোঁয়া এবং বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আবর্জনা (৫ নং চিত্র) বাতাসকে নিয়মিত দূষিত করে চলেছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে স্বাভাবিক দূষণের জন্য দায়ী আগ্নেয়গিরির বিষাক্ত গ্যাস, মরুভূমির ধুলো বালি, লোহার মরচে, দাবানলের ধোঁয়া ইত্যাদি।

বাতাসে যে সব দূষিত পদার্থ থাকে তা বাতাসের বেগে খাড়া উপরে ওঠে এবং সামনে এগিয়ে যায়। বাতাস যত বেগবান, বাহিত পদার্থ কণাও ততদূর ভেসে যায়। দূষিত বায়ু বৃহত্তর বায়ুস্তরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে দূষণের হার ক্রমশ পাতলা (Diluted) হয়ে যায়। দেখা গেছে বায়ুর গতি মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত (নিম্নাকাশের সীমানা) দ্রুতলয়ে বেড়ে চলে। এর উপরে বেগ বৃদ্ধির হার কমে আসে। সূর্যরশ্মি বাতাসে তাপ প্রবাহের উত্তালতা সৃষ্টি করে যার ফলস্বরূপ বাতাসের সঙ্গে মাটির ধূলিকণার ঘনতর সংমিশ্রণ ঘটে। রাত্রে তাপপ্রবাহ কম থাকায় এই মিশ্রণ হয় অনেক অল্প পরিমাণে।

উত্তাল বায়ুপ্রবাহে বহমান বায়ুর সাথে পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত স্থির বায়ুর



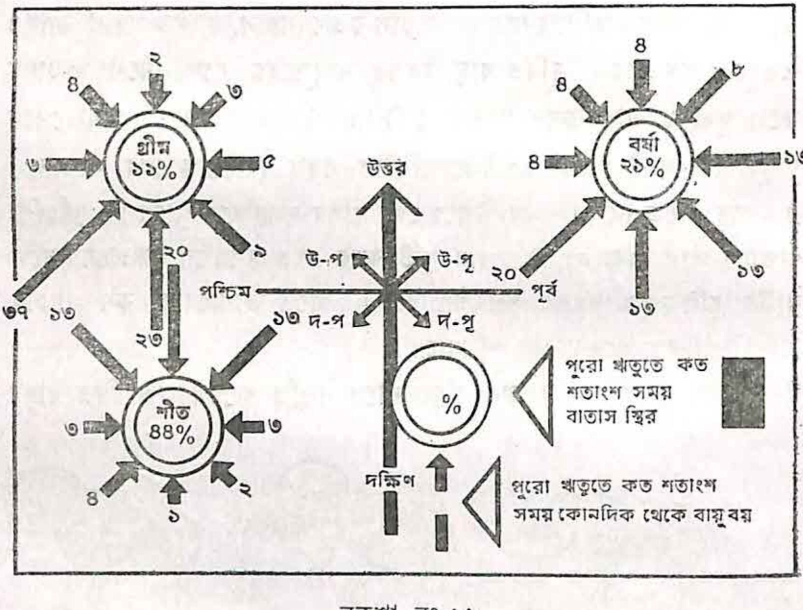
নকশা নং-১০

ঘর্ষণে ঘূর্ণিবায়ু বা বাতাসের **আবর্ত-গতি** (Eddy-motion) সৃষ্টি হয়।

এই ঘূর্ণিবায়ু পাক খাওয়া গতি ভাসমান ধূলিকণাকে বৃহত্তর বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে সাহায্য করে। আবর্ত ছোট মাপের হলে ধূলিকণা স্বল্প জায়গায়, ধারে কাছে ছড়িয়ে পড়ে। বড় আবর্তে ছড়ায় দূরদূরান্তরে (১০নং নকশা)[৪]।

প্রবাহের মত বাতাসের প্রসারণ ও (Defusion) ধূলিকণাকে বাতাসে ভেসে বেড়াতে সাহায্য করে। দূষিত বাতাস বিস্তৃত হয়ে যে চারিদিকের বাতাসে প্রসারিত বা মিশ্রিত হয় তার গভীরতাকে বলা হল মিশ্রণ-গভীরতা। এই মিশ্রণ-গভীরতা যত বাড়বে, বায়ুস্তরে দূষণের মাত্রা তত পাতলা হয়ে আসবে।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বাতাসের গতিপথ বদলায়। কোলকাতার আশে-পাশে যে বাতাস গ্রীষ্মকালে ধূলিকণাকে উত্তর-পূর্বে যতদূর টেনে নিয়ে

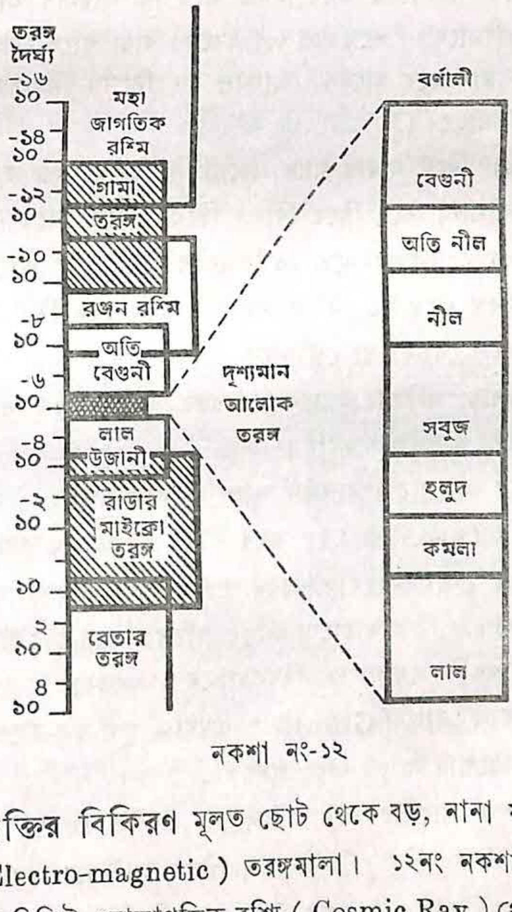


নকশা নং-১১

যাবে, বর্ষার স্থিরতর বাতাস পারবে না ততদূর টানতে। আবার শীতকালে সেই বাতাসই ধূলিকণাকে বয়ে নিয়ে যাবে দক্ষিণে তার উত্তুরে হাওয়ার প্রভাবে (১১নং নকশা)। এই নকশা থেকেই বোঝা যাবে শীতকালে ধোঁয়াশার কারণ; ৪৪% সময় বাতাস স্থির থাকে বলে দূষিত ধোঁয়ার অপসারণ কম হয়।

আবহ-পরিবেশে বাতাসের সঙ্গে কাজ করে সৌরশক্তি (৪নং নকশা)। সৌরশক্তির দুটি ভাগ—আলো ও তাপ। এবার আমরা পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অনুশীলন করব এই দুটির।

মানুষ উপাসনা করে সূর্যের, কারণ সৌরশক্তিকে বাদ দিয়ে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সূর্যই যার প্রধানতম আকর সেই আলোকরশ্মি বিনা উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ সম্ভব নয়। সবুজ উদ্ভিদকে বাদ দিয়ে প্রাণিজগতের পক্ষেও বেশীদিন জীবনধারণ সম্ভব নয়, কারণ মাংসাশী প্রাণীরাও তৃণ ও উদ্ভিদ্‌ভোজী প্রাথমিক স্তরের গ্রাহকদের মারফৎ পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।



নকশা নং-১২

সৌরশক্তির বিকিরণ মূলত ছোট থেকে বড়, নানা মাপের তড়িৎ-চৌম্বক (Electro-magnetic) তরঙ্গমালা। ১২নং নকশায় দেখা যাবে, ক্ষুদ্রতম তরঙ্গবিশিষ্ট মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) থেকে শুরু করে

গামা রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি ও অতি-বেগুনী রশ্মিকে ক্ষুদ্র-তরঙ্গবিশিষ্ট রশ্মি বলা যেতে পারে। অপর দিকে দীর্ঘতম তরঙ্গ-বিশিষ্ট বেতার রশ্মি থেকে শুরু করে রাডার-রশ্মি ও লাল উজানী রশ্মিকে বলা চলে দীর্ঘ তরঙ্গবিশিষ্ট রশ্মি। দুয়ের মাঝখানে অতি সামান্য অংশ জুড়ে রয়েছে দৃশ্যমান আলোক-রশ্মি (তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ৩৯০ থেকে ৭০০ ন্যানোমিটার)। দৃশ্যমান আলোক বর্ণালীতে রয়েছে সাত রং (বেগুনী, নীলচে বেগুনী, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল।[৫]

বাতাস ও আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসতে হয় সূর্যের আলোকে। এই আবহাওয়ার স্তর কতটা পুরু, কতটা ঘন, তার মধ্যে কি পরিমাণ জল বা ধুলো আছে—এইসবের উপর নির্ভর করে কি পরিমাণ আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছাবে। পথে যত এই ধরনের বাধা পাবে ছুটে আসা সূর্যের আলো ততই ম্লান হয়ে যাবে। আকাশ যত নির্মেঘ, নির্মল হবে, আলোর ঔজ্জ্বল্য ততই বাড়বে।

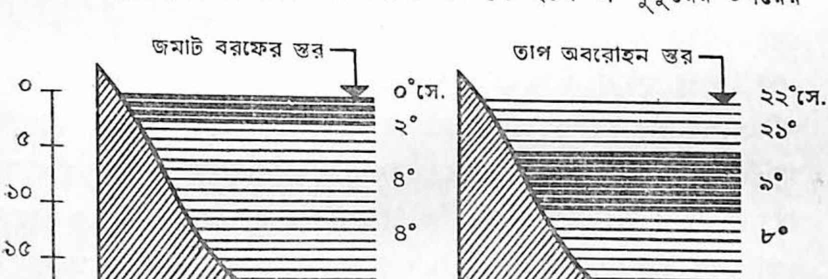
জলের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোর প্রতিসরণ হয় অর্থাৎ বর্ণালীর সাতটি রং আলাদা হয়ে গিয়ে বিভিন্ন দিকে এগুতে থাকে। তার ফলে লাল ও কমলা রং জলের মধ্যে ২০ মিটারের বেশী প্রবেশ করতে পারে না। হলদে রং প্রবেশ করে ৫০ মিটার, সবুজ ও নীল ১০০ মিটার অবধি এবং এর নিচে কেবল বেগুনী রং পৌঁছাতে পারে। তাই কম গভীর জলকে সাদা স্বচ্ছ দেখায়, পরিষ্কার হলেও গভীরতর জলকে সবুজ ও সমুদ্রের মত অতিগভীর জলকে সুনীল দেখায়।

জীবজগতে আলোর প্রধানতম কাজ সালোক-সংশ্লেষ। সবুজ পাতার ক্লোরোফিল আলো থেকে গ্রহণ করে নীল, বেগুনী ও লাল রং-বিশিষ্ট রশ্মি। হাওয়া থেকে সংগৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মাটি থেকে সংগৃহীত জলকে আলোক শক্তির সাহায্যে উদ্ভিদ পরিণত করে গ্লুকোজে।[৬] এই গ্লুকোজই প্রাণশক্তি যোগাচ্ছে বিশ্বচরাচরে। এছাড়া উদ্ভিদের আকার, স্বাস্থ্য, জীবনকাল, বাড় (Growth), এমনকি ফুল-ফল-বীজের বিকাশও নির্ভর করে আলোর প্রাচুর্য এবং প্রখরতার উপর।

প্রাণিদেহেও আলোর প্রভাব অসীম। প্রাণীর দেহবর্ণ, জনন ক্রিয়া, দেহগঠন, শারীরিক বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি, গমনাগমন, অভিপ্রয়াণ (Migration) এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশও আলোর উপর কমবেশী নির্ভরশীল। প্রাণিদেহের

প্রোটোপ্লাজম জীবনের মৌল উপাদান। আলো এই উপাদানকে আয়নিত করে তোলে। যার ফলে শরীরের বিপাক ক্রিয়া (Metabolism) ত্বরান্বিত হয়, দেহ খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বৃদ্ধি পায়, বলশালী হয়। এক কথায়, আলোকরশ্মি পরিবেশের এক জটিল প্রভাবশালী শক্তিবিশেষ।

আলোর পর **তাপ**। একই শক্তির রূপান্তর মাত্র। তাপরূপেও তার উদ্ভিদ ও প্রাণিরাজ্যে প্রভাব নানাতর। শারীরিক বিপাক-ক্রিয়া, আহার, শ্বাস-প্রশ্বাস, দেহবৃদ্ধি, জীবনধারণ, জনন ও বাস্তু-বিন্যাস জীবজগতের সব ব্যাপারেই তাপের একটা না একটা ভূমিকা আছে। জলের থেকে স্থল পরিবেশে তাপমাত্রার বৈচিত্র্য অনেক বেশী। নিম্নতম তাপমাত্রার হার : পুকুরের জলে o° সেঃ, সমুদ্রে—২·৫° সেঃ আর স্থলে (সাইবেরিয়া, ১৯৪৭) —৭০° সেঃ। উচ্চতম তাপমাত্রার হার : পুকুরের জলে ও সমুদ্রে ৩৬° সেঃ কিন্তু স্থলে ৬০° সেঃ। দিন ও রাত্রে পরিবেশের তাপমাত্রার তফাৎ হয়। জলে এ তফাৎ ১° সেঃ-এর বেশী হয় না, স্থলে তা হতে পারে ১৭° সেঃ পর্যন্ত (মরুভূমিতে কখনো-সখনো এই তফাৎ ৪০° সেঃ পর্যন্ত দেখা যায়)। জলে তাপের একটা স্তরবিন্যাস হয়। নির্মল জল ৪° সেঃ সবচেয়ে ঘন ও ভারী। গ্রীষ্মকালে বাতাসের তাপমাত্রা ২৭° সেঃ হলে তা পুকুরের উপরের



নকশা নং-১৩

জলকে ২২-২৩° পর্যন্ত তপ্ত করে তুলতে পারে। কিন্তু নীচের ভারী জল ৪°-তেই থেকে যাবে কারণ পরিচলনের মাধ্যমে ঠাণ্ডা ও গরম জলে কোন মিশ্রণ হবে না। বড়জোর পরিবাহিত তাপে তলার জল ১° উত্তপ্ত হয়ে ৪-এর জায়গায় ৫°-তে দাঁড়াতে পারে। আবার চরম শীতে উপরের জল

যদি ০°-তে জমে বরফও হয়ে যায়, ৪° সেঃ তাপমাত্রার ভারী জল নিচে নেমে সেখানে ওই তাপমাত্রাতেই স্থির হয়ে থাকবে (১৩নং নকশা)।

নিম্নতম যে তাপে জীব বেঁচে থাকে, সেই তাপমাত্রাকে বলা হয় ন্যূনতম ত্বরণ তাপ (Minimum Effective Temperature)। যে তাপে শারীরিক বিপাকক্রিয়া ও জননপ্রক্রিয়া সবচেয়ে দ্রুত ও সক্রিয় হয়ে ওঠে উচ্চমান তাপ (Optimum Temperature) এবং সর্বোচ্চ যে তাপ জীব সহ্য করতে পারে তাকে উচ্চতম সহনীয় তাপ বা ত্বরণ তাপ (Maximum Effective Temperature) বলা হয়।[৭]

জীবরাজ্যে দু' ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখা যায়ঃ (১) **উষ্ণদেহী** ও (২) **শীতলদেহী**। প্রায় সব পাখী ও স্তন্যপায়ী জীবই উষ্ণদেহী, যাদের দেহের রক্ত সারাদেহে নিজস্ব তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে চলে। শীতলদেহী বলতে বোঝায় সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, মাছ ও বিভিন্ন উদ্ভিদ। এদের দেহের নিজস্ব কোন তাপমাত্রা থাকে না। পরিবেশের তাপমাত্রাই শীতলদেহীর শারীরিক তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম, ফলন বা ফুল ফোটা সবকিছুই একান্তভাবে পরিবেশের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। দৈহিক তাপ সৃষ্টির ব্যাপারে শীতলদেহীর কোন স্বাধীনতা নেই। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই শ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রকৃতি এক বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে যাকে বলা চলে **সুপ্তায়ন** (Dormancy)। পরিবেশের তাপ যখন মাত্রাতিরিক্তভাবে কমে যায় বা বেড়ে যায়, পরিবেশে ঘাটতি দেখা দেয় জল ও খাদ্যের, তখন এইসব শীতলদেহী শরীরের সাধারণ বিপাক ক্রিয়া বন্ধ করে দিয়ে এক চৈতন্যহীনতার মধ্যে ঢলে পড়ে একে বলা চলে শীত ঘুম (Hibernation) এবং গ্রীষ্ম-ঘুম (Aestivation)। এই সময় বিপাক ক্রিয়াই যে কেবল মৃদু গতি হয় তা-ই নয়, হৃৎস্পন্দন, দেহের তাপ, দেহবৃদ্ধি সবই খুব কমে যায়। পরিবেশের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তখন এরা আবার জেগে ওঠে ও এদের শরীরে জীবনের লক্ষণাদি এক এক করে ফুটে ওঠে। যে সব প্রাণীর মধ্যে সুপ্তায়ন হয় না তারা অতিশীতোষ্ণ অবস্থাকে সহনশীল করে তোলার জন্য অভিপ্রয়াণে (Migration) অভ্যস্ত হয়। এই **অভিপ্রয়াণ** হতে পারে কোন অনুকূল আবহাওয়ায় (সাইবেরীয় হাঁস), উভচরের ক্ষেত্রে স্থল পরিবেশ আশ্রয় নিয়ে (ব্যাং), গাছের কোটর বা মাটির বিবরে ঢুকে গিয়ে

(মরুভূমির ইঁদুর) এবং দিবাচর থেকে নিশাচর হয়ে গিয়ে (বাঘ ও বিড়ালজাতীয় প্রাণী)। সুপ্তায়ন ও অভিপ্রয়াণ সবই মূলতঃ পরিবেশগত ভারসাম্য (তাপ বিষয়ক) বজায় রাখতে প্রকৃতির নিজস্ব ব্যবস্থা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব তাপ প্রাণী সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির নানান রোধক (Brake)-এর অন্যতম।

সংস্কৃত ভাষায় একটা প্রবাদ আছে 'ধূমাৎ বহ্নি।' অর্থাৎ ধোঁয়া দেখতে পেলে বুঝতে হবে সেখানে আগুন আছে। এ হেন যুক্তির প্রধান কারণ প্রস্তর যুগ থেকে আজ অবধি যত আগুন মানুষ জ্বেলেছে, তার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে গাছের ডালপালা, গুঁড়ি, পাতা, কয়লা, খনিজ তেল বা গ্যাস, বিষ্ঠা। এ সব ক'টি জ্বালানীই ধূম্র উদ্গীরণ করে দহনের সময়। আর এই ধোঁয়ার মধ্যে থাকে আংশিক জারিত কার্বন যার বৈজ্ঞানিক নাম কার্বন মনোক্সাইড, থাকে কার্বনিক অ্যাসিড যা পাথরকেও জর্জরিত করে ফেলে কালক্রমে, থাকে সীসে যা ফুসফুসের পক্ষে মারাত্মক, থাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যা মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে পৃথিবীর উপর একটি পুরু ঘেরাটোপ রচনা করেছে। এর মধ্যে দিয়ে আলোকরশ্মি চলে আসছে কিন্তু তা পৃথিবীর বুকে প্রতিফলিত হয়ে যখন তাপরশ্মিতে পরিবর্তিত হয় তখন ঐ ঘেরাটোপই আর ঐ তাপরশ্মিকে তার মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যেতে দিচ্ছে না। ফলং? পৃথিবীর আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে উত্তাপ। এই ক্রম উষ্ণ আবহাওয়া কালক্রমে অতি উষ্ণ হয়ে ক্ষতি করছে পরিবেশগত ভারসাম্যের।

আজ যে বিজ্ঞানীরা হন্যে হয়ে পরিবর্ত শক্তির খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন, নানা কারণের মধ্যে পরিবেশ দূষণও তার অন্যতম। এ পর্যন্ত যেসব পরিবর্ত শক্তির সন্ধান মিলেছে তার মধ্যে প্রধান হল[৮]:

(১) সৌরশক্তি—রূপান্তর ঘটিয়ে পাওয়া যাচ্ছে তাপ (সৌরচুল্লী) এবং বিদ্যুৎ (ফটো ভোল্টাইক সেল)।

(২) বায়ুশক্তি—রূপান্তর ঘটিয়ে পাওয়া যাচ্ছে গতিশক্তি (উইণ্ড মিল, ভার্টিকাল অ্যাক্সিস মোটর), বিদ্যুৎ শক্তি (এয়ার জেনারেটার), জল শক্তি (এয়ার পাম্প, টারবাইন)।

(৩) জলশক্তি—রূপান্তর ঘটিয়ে পাচ্ছি বিদ্যুৎ (টারবাইন), জোয়ার ভাঁটার গতিশক্তি ইত্যাদি।

এছাড়া পরিবর্ত-জ্বালানী হিসাবে রয়েছে পারমাণবিক জ্বালানী, কৃষি আবর্জনা, বায়োগ্যাস ইত্যাদি। তবে এগুলি থেকে পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনাও রয়েছে যথেষ্ট। পরিবর্ত শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্ভাবনাপূর্ণ হচ্ছে আণবিক শক্তি কিন্তু এর মাধ্যমেই পরিবেশে ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তিও আংশিকভাবে জল-শক্তির (বৃষ্টির জল) মূল আকর আকাশ ও আবহ পরিবেশ। এগুলির যথোপযুক্ত ব্যবহারে দূষিত পরিবেশ ক্রমে নির্মল থেকে নির্মলতর হয়ে উঠতে পারে।

রোদ দাও ফাটল ধরাও
আকাশের পলি জমা বুকে।
সকৌতুক সবিস্ময় নীল
ঝরুক
ধরুক
নদী, সমুদ্রে ও প্রাণে।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

পরিবেশ বিজ্ঞানীর সাধনাও ঐ নীলটুকুকেই ঝরানো।

---

১. কোটপাল ও বালি ২. তারকমোহন দাস ৩. সলিল লাহিড়ী ৪. সলিল লাহিড়ী ৫. সমরেন্দ্র সেন ৬. তারকমোহন দাস ৭. কোটপাল ও বালি ৮. অমিতাভ রায়।

ফকির এসে ভিক্ষে চাইল রাজা হবুচন্দ্রের কাছে। ভিক্ষের শর্ত পয়লা দিন দিতে হবে একটি পয়সা, দ্বিতীয় দিন তার ডবল দুটি, তৃতীয় দিনে তস্য ডবল—চারটি। এইভাবে তিরিশ দিন ডবল ডবল করে ভিক্ষে দিয়ে যাবেন রাজা। আর এই সামান্য ভিক্ষের বদলে তিরিশ দিন ধরে রাজার হয়ে আল্লার দোয়া প্রার্থনা করবেন ফকির সাহেব। প্রাসাদের পশ্চিম অলিন্দে বসে সুবো সাম পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়বেন তিনি। সেই পুণ্য নামগানে পবিত্র হয়ে উঠবে প্রাসাদের অঙ্গন। শান্তি আর শ্রীতে ভরে উঠবে রাজসভা, নগরের প্রতিটি মহল্লা। পুণ্যলোভী হবুচন্দ্র দেখলেন

8 জৈব সমাজ ও প্রাণিসংখ্যা
BIOTIC COMMUNITY & POPULATION

এত সস্তায় কিস্তিমাৎ লাখে একবারই হয়। শুরু হল খয়রাৎ। মন্ত্রী গবুচন্দ্র সি. এল. নিয়ে গেছলেন মেয়ের বাড়ী। এসে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বল্লেন, মহারাজ এ কি করেছেন? এ ভিক্ষে দিতে একমাসে লাগবে ১,৬৭,৭৭,২১৬ টাকা! গাণিতিক হিসাব বুঝে রাজার হার্ট অ্যাটাক—খাবি খেয়েই খতম। গবুচন্দ্রের সাথে মিল আছে ম্যালথাসের। তিনি বলেছেন খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে পাটি-গাণিতিক ক্রমবৃদ্ধির নিয়মে। জন্মহার কিন্তু বাড়ছে গুণোত্তর হারে। ফলে খাদ্যাভাব, হানাহানি, মৃত্যু।

দুটি কারণে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছে। এক, পরিবেশ দূষণ ; দুই, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে স্তিমিত বিলম্বিত করতে প্রায় প্রতিটি দেশেই নানাভাবে, নানা পথে শুরু হয়েছে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলন। পরিবেশ বিজ্ঞানে জনসংখ্যা বলতে বোঝায় জীবসংখ্যা। একই জাতের বা শ্রেণীর যে সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা পরিবেশে বসবাস করে তাদের সম্মিলিত সংখ্যাকে বলা হয় **জীবসংখ্যা** (Population) এবং দলবদ্ধ এই গোষ্ঠীকে বলা হয় জৈব গোষ্ঠী। একটি জৈব গোষ্ঠীর নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ থাকা দরকার : (১) জৈব ঘনত্ব (Population Density)—নির্দিষ্ট পরিবেশের প্রতি এককে বসবাসকারী জীবের সংখ্যাকে বলা হয় জৈব ঘনত্ব। যেমন, কোন বনভূমির জৈবঘনত্ব হিসাবে বলা যায় একর প্রতি এতগুলি গাছ কিম্বা জল পরিবেশের বেলায় প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার ততগুলি জীবাণু। (২) **জন্মহার** (Natality)—সময়ের একক বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন জৈবসমাজে আগত সমস্ত নবজাতকের সংখ্যা। (৩) **মৃত্যুহার** (Mortality)—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন জৈবসমাজে মৃতের সংখ্যা। (৪) জীবসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Population Growth Rate)—জন্মহার থেকে মৃত্যুহার বাদ দিলে পাওয়া যায় ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জৈবসংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার হার। এই সংখ্যাগুলির যথাযথ অনুশীলন করলে পাওয়া যায় জীবসংখ্যা বাড়া বা কমার হার এবং জীবসংখ্যা বিস্তার (Population Dispersal), অভিপ্রয়াণের হার, প্রজননক্রিয়ার হার (Reproductive Fitness) এবং উক্ত জৈবসমাজের জীবন-দৈর্ঘ্য (Persistence অর্থাৎ কতদিন তারা টিকে থাকবে ধরার বুকে)।

১৯৮২ সালের বিভিন্ন দিনের সংবাদপত্রে পেয়েছি নিচের ক'টি খবর :

(ক) বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় চিতাবাঘ ও ছুঁচলো মাথাওয়ালা রাজহাঁসের বাসস্থানে আবাদ করে ফেলা ও শিকারীর উৎপাতের ফলে এই প্রজাতিদ্বয় ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে এসেছে বলে জানান কৃষিদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী (৬.৮.৮২)।

(খ) জাটিঙ্গায় পাখি ও জীবহত্যা বন্ধ করে এদের অবলুপ্তি রোধের জন্য

সব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। পরিবেশ অনুকূল হওয়ায় জাটিঙ্গায় নানা ধরনের কীট, সরীসৃপ ও প্রায় ৭২ প্রজাতির পাখি বাস করে, যা ভারতের অন্যত্র অবলুপ্তপ্রায় (১৬.৮.৮২)।

(গ) আর্জেন্টিনার প্যাটাগোনিয়ানা উপকূলে পেঙ্গুইন বধ করার বিরুদ্ধে রয়েছে জাতীয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন। একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা এই আইনের বিরোধিতা করে মামলা লড়ছেন। তাঁরা জিতলে হাজার হাজার পেঙ্গুইনকে জীবন হারাতে হবে (২৩.৯.৮২)।

(ঘ) কেনিয়ার সহকারী পরিবেশ মন্ত্রী বলেছেন প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ শিশু আফ্রিকায় ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় (১৫.৯.৮২)।

(ঙ) সাদা ডানার হাঁস উড ডাক যা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে তাদের একটি ছোট দলকে সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের মিয়াও মহকুমার মুঞ্জাল গ্রামে পাওয়া গেছে (১৬ ৯.৮২)।

(চ) শিম্পাঞ্জী আজ অবলুপ্তির পথে। বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের হিসাব অনুযায়ী আফ্রিকার ক্রান্তীয় অরণ্যে ৩০ বছর আগে কয়েক লাখ শিম্পাঞ্জী ঘুরে বেড়াত ; বর্তমানে শিম্পাঞ্জীর সংখ্যা সেখানে সতেরো হাজার (৫.৫.৮২)।

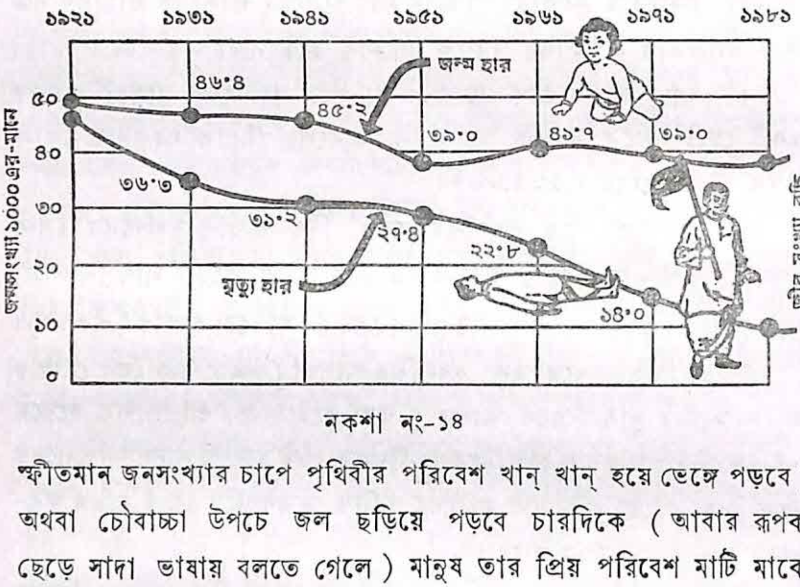
উপরের বিভিন্ন খবরে যেসব অবলুপ্তির আশঙ্কা (অর্থাৎ উক্ত জৈব গোষ্ঠীর জীবন-দৈর্ঘ্যের হ্রাস বিষয়ক আশঙ্কা) করা হয়েছে তা প্রতিফলিত হয়েছে ওই সমাজের জন্ম-মৃত্যুর হার নিয়ে অনুশীলনে। এই ধরনের নানা অনুশীলনের ফলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ভীষণভাবে বিপন্ন যদিও জন-সংখ্যা বাড়ছে গুণোত্তর হারে।

নিচের সারণী থেকে দেখা যাবে ভারতে প্রতি ১০০০ মানুষে বিভিন্ন সময় জন্ম ও মৃত্যু হার থেকে কিভাবে জীবসংখ্যা বৃদ্ধির হার বার করা হয়েছে :

৩নং সারণী

খ্রীষ্টাব্দ	জন্মহার	মৃত্যুহার	জীবসংখ্যা বৃদ্ধি
১৯৬১	৪১·৭	২২·৮	১৮·৯
১৯৭১	৩৯·০	১৪·০	২৫·০
১৯৮১	৩৭·৬	১০·০	২৭·৬

পূর্বোল্লিখিত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের প্রগতির সাথে সাথে মৃত্যুহার কমে আসছে। জনবিস্ফোরণের সাথে সাথে জন্মহার বেড়ে চলেছে। ফলে মোট জীব বৃদ্ধির হারও বেড়েই চলেছে (১৪নং নকশা)। চলুন ফিরে যাই প্রথম অধ্যায়ে যেখানে আমরা পরিবেশ পদ্ধতির সাথে তুলনা করেছিলাম চৌবাচ্চার জল আগমন-নির্গমনের। কল্পনা করুন আগমনের হার যদি সব সময় নির্গমনের হার থেকে বেশী থাকে, একসময় হয় চৌবাচ্চাটি টইটুম্বুর ভরে জলের চাপে ফেটে পড়বে (অথবা রূপক ছেড়ে বলা যায়



নকশা নং-১৪

স্ফীতমান জনসংখ্যার চাপে পৃথিবীর পরিবেশ খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়বে) অথবা চৌবাচ্চা উপচে জল ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে (আবার রূপক ছেড়ে সাদা ভাষায় বলতে গেলে) মানুষ তার প্রিয় পরিবেশ মাটি মাকে ছেড়ে সমুদ্র বা মহাকাশে অভিপ্রয়াণ করতে বাধ্য হবে। মনুষ্য গোষ্ঠীর এই বিপদের বার্তা লুকিয়ে আছে উপরের সারণীতে যার অনুশীলন করেই বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করছেন নিম্নহারে ভবিষ্যত জনসংখ্যার স্ফীতি :

৪নং সারণী

খ্রীষ্টাব্দ	পৃথিবীর জনসংখ্যা	ভারতের জনসংখ্যা
১৯৮০	৪২১·২ কোটি	৬৮·৪ কোটি
১৯৮৫	৪৪০·৩ „	৭৬·২ „
২০০০	৬৯০·৮ „	৯৫·০ „

অভিপ্রয়াণের ব্যাপারটায় আমরা পরে আসছি। তার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করে না নিলে পরে আর প্রাসঙ্গিক সুযোগ আসবে না। এই প্রক্রিয়াটি হল **'সীমায়িতকরণ'** (Limiting factor)[১]। প্রকৃতির বুকে কোন এক জাতের জীব-সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত কমে বা বেড়ে যেতে চাইলে পরিবেশগত রোধক-ক্রিয়া তাতে বাধাদান করে ও জীবসংখ্যাকে নির্দিষ্ট মাত্রা বজায় রাখতে বাধ্য করে। যেমন কোন পুকুরে যদি মাছ ও সরীসৃপের সংখ্যা বেড়ে উঠতে চায় তা হলে অক্সিজেনের অভাব তা হতে দেবে না। এইভাবে খাদ্যের পরিমাণ, তাপমাত্রার আর্দ্রতা, শক্তির সরবরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন রোধক পরিবেশে জীবসংখ্যা সীমায়িতকরণে সাহায্য করে। কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে এইসব রোধকগুলিকে পরাভূত করে নিজের তাঁবেদার করে তুলছে। ফলে তারা প্রাকৃতিক নিয়ম না মেনে মানুষের আজ্ঞাবহ হয়ে পড়ছে। এই সুযোগে মানবসমাজের জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে উঠছে। যদি আমাদের জনসংখ্যার উপযোগী জমি বাড়তি থাকত যেখানে চাষ-আবাদ বা জনবসতি গড়ে তোলা যেত তাহলে কোন সমস্যাই থাকত না। কিন্তু জমির তুলনায় আমাদের লোকসংখ্যা উদ্বৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। সমস্যা দেখা দিচ্ছে খাদ্য-পানীয়-বস্ত্র সরবরাহের, বাড়ছে বেকারত্ব। ৫নং সারণীতে তুলনামূলকভাবে দেখানো হয়েছে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও বৃহত্তর কোলকাতার জনবৃদ্ধির হার (প্রতিবর্গ কিলোমিটারে):

৫নং সারণী[২]

খ্রীষ্টাব্দ	ভারত	পশ্চিমবঙ্গ	কোলকাতা
১৯২১	৭০	১৯৯	১৫৭৯
১৯৩১	৮৭	২১৫	১৭৮২
১৯৪১	১০০	২৬৪	৩০২৪
১৯৫১	১১৩	২৯৯	৩৭৬৮
১৯৬১	১৩৭	৩৯৮	৪৭১৬
১৯৭১	১৭২	৫০৪	৫৮৪৬

উপরের এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে সমগ্র ভারতীয় অঞ্চলের হিসাব

ধরলে পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব ভারতের জনঘনত্বের তুলনায় তিন গুণ বেশী আর কোলকাতার ঘনত্ব তো ৩৪ গুণ বেশী। লিমিটিং ফ্যাক্টরের ক্ষমতা আজ লিমিটেড হয়ে পড়েছে। মানুষের সমৃদ্ধি (সংখ্যামূলক) হয়ে উঠছে মানুষের অবলুপ্তির কারণ।

মানব পরিবেশের ভালমন্দ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ফরমূলাটা এইরকম: ৩

পরিবেশের উপর চাপ = জনঘনত্ব × ধনতান্ত্রিক প্রাচুর্য × প্রযুক্তি। এই ফরমূলা থেকে এটা পরিষ্কার যে পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে কেবল জনসংখ্যা সীমায়িত করলেই চলবে না; ধনের সুষ্ঠু বন্টন ও শিল্পপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধন করেও এই ভারসাম্য ফিরে পাওয়া সম্ভব। ডঃ তারকমোহন দাস পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন কোলকাতার রাস্তায় যত গাড়ী চলে নিউইয়র্কে চলে তার দশগুণ। অথচ কোলকাতায় গাড়ীর ধোঁয়া থেকে উদ্ভূত কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ নিউইয়র্কের তুলনায় ১৪ গুণ বেশী। কারণ আমাদের মান্ধাতার আমলের গাড়ীর ঝরঝরে ইঞ্জিনের সাবেকী প্রযুক্তি ও জ্যামজমাট রাস্তায় অকারণ তেল পুড়িয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি যা নিউইয়র্কের উন্নত প্রযুক্তিযুক্ত গাড়ীর ইঞ্জিন ও গতিশীল যানবাহন, তা সংখ্যাগতভাবে যত বেশীই হোক কোনদিনই উৎপাদন করবে না। এই বইয়ের নিরীক্ষক অধ্যাপক মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের মতে ১৯৭৩-এর হিসাবে ভারতের জনবসতির ঘনত্ব ১৭৫। জাপানে এই ঘনত্ব ২৯১, পঃ জার্মানিতে ২৪৯, ইংল্যাণ্ডে ২২৯। অথচ পরিবেশগত ভারসাম্য সেখানে অনেক উন্নত। কারণ এইসব দেশের সুষ্ঠু ধনতান্ত্রিক বন্টনব্যবস্থা এবং উন্নত ধরনের শিল্পপ্রযুক্তি। তাঁর মতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহলে ১৯৭২ সাল নাগাদ দারিদ্র্য-দূষণ (Pollution of Poverty) বলে যে কথাটি চালু হয়েছে, ভারতের পরিবেশ দূষণের তা অন্যতম প্রধান কারণ।

জৈবসংখ্যা বিস্ফোরণের পরই শুরু হয় অভিপ্রয়াণ (Migration): (১) বহির্মুখী—এক পরিবেশের জীব আংশিকভাবে আশ্রয় নেয় অন্য পরিবেশে। (২) অন্তর্মুখী—অন্য পরিবেশের জীব নির্দিষ্ট পরিবেশে এসে ঢুকছে। এইসব অভিপ্রয়াণ চিরকালীন বা সাময়িক। দু'ধরনেরই হতে পারে। খাদ্যাভাব বা খাদ্যপ্রাচুর্যে, শত্রুভয়, বাতাস ও জন্মের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা, আলো ও তাপের হ্রাসবৃদ্ধির কারণেও ঘটে এধরনের

অভিপ্রয়াণ। নির্দিষ্ট পরিবেশের মোটজীব ও উদ্ভিদ্‌রাজিকে সম্মিলিতভাবে বলা হয় জৈব সমাজ (Biotic Commuity)। একটি জৈব সমাজের বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে পরিবেশগত পরিপূরকতা বজায় থাকে। এবং থাকে সংখ্যার দিক দিয়ে প্রধান ও অপ্রধান শ্রেণীর ভাগ বিচার। যেমন ধরা যাক, একটি বড় মাপের দুগ্ধ-খামার। এই পরিবেশের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে ঃ

তৃণভূমি—৪৫ একর	ছাগল—১০টি
সবজি চাষ—৫ একর	হাঁস—৮টি
নিম গাছ—৬টি	বুনোপাখী—৪০টি
আম গাছ—১টি	গরু—১১০টি
পেয়ারা গাছ—৭টি	মোষ—৪টি
মুরগী—২০টি	বাঁশবন—২ বিঘা

উপরের এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে এই খামার পরিবেশে উৎপাদক হিসাবে তৃণভূমি ও গ্রাহক হিসাবে গরুই প্রধান। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মূল দায়িত্বও এদেরই। এর ফলে এদের প্রভাব অনুযায়ীই গড়ে উঠবে পরিবেশ ভারসাম্য। এই প্রাকৃতিক ভারসাম্যে মানুষ ও তার বিজ্ঞান অনেক সময় হস্তক্ষেপ করে বসে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা না করেই। হয়ত ব্যবসায়িক চাহিদার জন্য সে অর্ধেক তৃণভূমিকে পরিণত করল সবজি চাষে। এর ফলে ছাগল, গরু ও মুরগীর খাদ্যে অনটন দেখা দেবে। হাঁস ও মোষ খাদ্য হিসাবে তৃণের উপর নির্ভরশীল নয় বলে তাদের অস্তিত্ব হয়ত বিপন্ন হবে না কিন্তু গরু, ছাগল, মুরগী হ্রাস হওয়ার ফলে টানাটানি দেখা দেবে জৈবসারে। এর প্রথম প্রতিক্রিয়া নিম, আম, পেয়ারার ফলন কমবে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে পাখীদের অর্ধেক হয়ত কমে যাবে বহির্মুখী অভিপ্রয়াণের দরুন। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া সবজি চাষেও হয়ত ফলন কমতে থাকবে। সারের ঘাটতি পূরণ করতে মানুষকে ঢালতে হবে অজৈব সার যা কিছুদিন বাদে মাটিকে করে তুলবে অতিক্ষারধর্মী, কৃষি বা ঘাস জন্মানোর অযোগ্য। আরো কিছুদিন বাদে আগাছাভরা এই খামারের খাঁ খাঁ করা পরিবেশে একটা ভাঙ্গা কাঠের ফলকে হয়ত লেখা থাকবে 'এখানে একদা মানবকের গো-পালন খামার ছিল।' অথচ মানুষ যদি সেদিন একটু ভেবে-চিন্তে খামার পরিবেশের

প্রধান উৎপাদক (তৃণদল) এবং প্রধান গ্রাহক (গো-বাহিনী)-এর পক্ষে ক্ষতিকর কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিত তাহলে এই চমৎকার পরিবেশটি টিকে থাকত যুগ যুগ ধরে তার ভারসাম্য বজায় রেখে। বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারে সজ্জিত মানুষ আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতির তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কাজেই প্রকৃতির কোলে কোনরকম পরিবর্তন করার আগে তাকে বহু চিন্তা-ভাবনা করে এগুতে হবে।

এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা করেই তাঁর খামার বাড়ীকে গড়ে তুলেছেন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ স্থপতি রবার্ট বায়ার্ড। রাজধানী মেলবোর্ন থেকে ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে এক গণ্ডগ্রাম ফ্লিণ্ডার্স। সেখানে কোন পৌরসভা নেই যে জল সরবরাহ করবে, কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Power House) নেই যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে, কোন বাজার নেই যে খাদ্য সরবরাহ করবে, এমন কি কোন বন্দর বা রেল স্টেশন নেই যে আমদানী হবে তেল, কয়লা, লোহা, সিমেন্ট—সভ্য জীবনের উপাদানসমূহ। এ হেন অচিন-পুরীতে বায়ার্ড সাহেব ২০ একর জমি নিয়ে এক খামার গড়ে তুলেছেন। তারপর ভোজবাজি ঘটিয়েছেন তাঁর পরিবেশ-প্রাসাদে (Ecology House)। গন্‌গনে গ্যাসের উনুনে রান্না হচ্ছে খামারের সবজিবাড়ী থেকে তোলা কফি, গাজর, লেটুস, খামারের লেক থেকে তোলা হেরিং, আর ট্রাউট মাছ। সেঁকা হচ্ছে প্রাসাদের বৈদ্যুতিক আটাচাকিতে পেষা খামারের গমজাত আটার রুটি। সারা বাড়ী ঝলমল করছে বৈদ্যুতিক আলোয়। হাওয়া কলে চালানো পাম্প দিয়ে তোলা ভূগর্ভ-জল বিনি খরচে সৌর-চুল্লীতে ফুটিয়ে পাইপে করে পাঠানো হচ্ছে রান্নাঘরে, স্নানঘরে, সুইমিং পুলে—প্রয়োজন মত গরম বা ঠাণ্ডা অবস্থায়। সৌর ব্যাটারী চালিত ট্র্যাক্টার চাষ করছে, ফসলের ওয়াগন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিক্টোরিয়ার হাটে। এই প্রাসাদের প্রত্যেকটি মালমসলাও এসেছে খামারের জঙ্গল আর কৃষি-ক্ষেত্র থেকে। একমাত্র ছাদে ব্যবহৃত অ্যাসবেস্টস চাদর ও বাথরুমের চীনামাটির বেসিন ও কমোড আনানো হয়েছে মেলবোর্ন থেকে। সিলিং-এর স্ট্র-বোর্ড (খড়ের চাদর), দেয়াল, দরজা ও জানলার পাইন কাঠ, ভিতের পোড়া ইঁট, বীম বর্গার অরেগন কাঠ, মেঝের কর্ক টালি সবই আঙ্গিনাতেই উৎপাদিত। ৫০০০ গ্যালন মাপের সুইমিং পুলটি অবশ্য কংক্রীটে তৈরী। জলের মূল সরবরাহ হয় ছাদে বৃষ্টির (বছরে গড়

বৃষ্টিপাত ৩৬ ইঞ্চি বা ৯১৪ মিলিমিটার) জল ধরে। খাবার ও স্নানের জল জোগায় ছাদের এই জলাধার। পরিবর্ত ব্যবস্থা হিসাবে ঘাটতি পূরণ করবার জন্য আছে হাওয়া কল-চালিত গভীর নলকূপ। সারা বছর ধরেই ঘন্টায় ১৩ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বইছেই। কাজেই জলের কোন অভাব নেই। জলের অপ্রতুলতা না থাকলেও অপ্রতুলতা আছে বিদ্যুতের।

বায়ু চালিত কুইর্ক জেনারেটারে ১১০ ভোল্টের তিন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা ২০টি ৬ ভোল্টের স্টোরেজ ব্যাটারীতে (যে জাতীয় ব্যাটারী মোটর গাড়ীতে লাগানো হয়) জমা রাখা হয়। সঞ্চিত বিদ্যুতে পাঁচ দিন অবধি আলো পাখা চালানো যাবে যদি বাতাসের অভাবে জেনারেটার নাও চলে। জেনারেটারটি বাড়ী থেকে ৫০ মিটার উঁচু একটি টিলার উপর বসানো আছে এবং গত সাত বছরে এরকম একবারও হয় নি যখন পরপর পাঁচ দিন বাতাসের অভাবে জেনারেটার অকেজো হয়ে রয়েছে। এই বিদ্যুতে আলো পাখা চলে, চলে ৪০০ ওয়াট পর্যন্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। সুইমিং পুল থেকে বাড়ীর ছাদে রাখা ট্যাঙ্কে জল তোলবার ছোট পাম্পটিও এই বিদ্যুতেই চলে। তবে যে সব যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুতের খরচ বেশী যেমন কুকিং রেঞ্জ, গীজার, ফ্রিজ ইত্যাদি চালানো সম্ভব হয় নি এখনো। গীজার না থাকলেও সৌরচুল্লী মারফত বিনা ব্যয়ে ঘরে ঘরে গরম জল সরবরাহের কোন ঘাটতি নেই। সৌরচুল্লীতে শক্তি জোগায় ৩৩ বর্গ মিটার মাপের তিনটি তাপ শোষক প্যানেল। এই প্যানেল তিনটি বাড়ীর ছাদে উত্তরমুখী করে সাজানো আছে। বর্ষাকালে সৌরচুল্লীর ক্ষমতা কমে গেলে রান্নাঘরে রাখা একটি কাঠের চুল্লীতে আংশিকভাবে জল গরম করে ঘাটতি পুরণ করা হয়।

তবে রান্না হয় মিথেন গ্যাসে। বাড়ীতে পায়খানার সেপটিক ট্যাঙ্কের পরিবর্তে রয়েছে একটি মিথেন ডাইজেস্টার। এতে পায়খানার ময়লা ছাড়াও পোলট্রি ও গোয়ালের আবর্জনাও কাজে লাগানো হয়। তরল সারটুকু ডাইজেস্টার থেকে বেরিয়ে পাইপে চালান হয়ে যায় সবজিবাড়ীতে। অন্য পাইপে বায়ো-গ্যাস বা মিথেন গ্যাস চলে আসে রান্নাঘরে জ্বালানী হিসাবে। পরিবর্ত জ্বালানী হিসাবে অবশ্য সঞ্চিত থাকে খামারের ইউক্যালিপ্টাস বন থেকে কুড়িয়ে আনা কাঠকুটো—যা দরকার মত ব্যবহার করা যায় কাঠের চুল্লীতে।

একটা কথা খেয়াল রাখবেন, কুইর্ক জেনারেটারে উৎপন্ন বিদ্যুৎ, সৌর-চুল্লীর তপ্ত জল, উইণ্ড মিলে উত্তোলিত জল, মিথেন ডাইজেস্টারের বায়ো-গ্যাস সবই পাওয়া যায় নিখরচায়—প্রাকৃতিক শক্তি বা খামারের জৈব আবর্জনাকে কাজে লাগিয়ে। আর প্রধান লক্ষণীয় তেল বা কয়লাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় না বলে কোন ধোঁয়া কালি বা অঙ্গারাত্মক গ্যাস (যথা, কার্বন ডাই-অক্সাইড বা মনোক্সাইড) পরিবেশকে দূষিত করে না। প্রয়োজনীয় শক্তি ও জ্বালানী উৎপাদনের ক্ষেত্রে বায়ার্ড সাহেবের বাড়ীটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্ব-নির্ভর এবং পরিপূর্ণভাবে ভারসাম্য যুক্ত। পরিবেশ প্রাসাদের মূল তত্ত্বই হল এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারসাম্য। এ প্রাসাদ হবে এমন বাড়ী যা তার আবর্জনাকে প্রাকৃতিক শক্তি অর্থাৎ বায়ু, সূর্যালোক, জলস্রোত বা জোয়ার ভাঁটা ইত্যাদির সাহায্যে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় জ্বালানী নিজেই সৃষ্টি করে নেবে পরিবেশকে কোনভাবে দূষিত না করে। এর জন্য বাড়ীপ্রতি প্রয়োজনীয় বন্যাঞ্চল, চারণক্ষেত্র ও পালিত পশুপাখীর সংখ্যা বজায় রাখাকেই বলে পরিবেশ সংরক্ষণ।

বায়ার্ড সাহেবের বাড়ীটি অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সার্থক **পরিবেশ প্রাসাদ**। ১৯৭৫ সালে এটি তৈরী করতে খরচ পড়েছিল ১৫০০০ ডলার। নির্মাতা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন রবার্ট নিজে, তাঁর ভাই জন বায়ার্ড এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী কুথবার্ট। ওয়েস্টার্ন পোর্ট উপসাগরের কোলে বসানো নয়নাভিরাম ভিক্টোরিয়া উপত্যকায় রবার্ট বায়ার্ড যে রূপকথার বাস্তবায়ন করেছেন আশা করি আমার মত যে সব স্থপতি পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে ভাবছেন তাঁদের সকলকেই তা উদ্বুদ্ধ করবে। শুধু এই আশাতেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার এতগুলি পাতা ভরিয়ে দিলাম বায়ার্ড-উপাখ্যানে।

আসুন আমরা এখন ফিরে যাই জৈবসমাজের তাত্ত্বিক আলোচনায়। বায়ার্ড উপাখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে, কোন জৈবসমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বনির্ভরতা একটি অত্যাবশ্যক লক্ষণ। সমাজগত বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণি-গোষ্ঠীর পারস্পারিক খাদ্যখাদক সম্পর্ক এই নির্ভরতা চক্রকে সম্পূর্ণ করে। কোন পরিবেশে কেবল উদ্ভিদ থাকলে এই চক্র পূর্ণ হবে না। ফলে সেখানে ক্রমাগত জমা হতে থাকবে পচনশীল জৈব পদার্থ যা উদ্ভিদের নিজের অস্তিত্বের পক্ষেই হবে মারাত্মক। এছাড়া এটাও চিন্তা করা দরকার যে, মৌমাছি বা প্রজাপতি জাতীয় কীট-পতঙ্গের অভাবে উদ্ভিদের পরাগ-মিলন

বা জনন ক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এক্ষেত্রেও উদ্ভিদের টিকে থাকা অসম্ভব। কাজেই পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপাদক উদ্ভিদ যেমন থাকতেই হবে, তেমনি থাকতেই হবে তৃণভোজী ও মাংসাশী গ্রাহক প্রাণী ও পচন-সংঘটক জীবাণু ও বীজাণু এবং পরভোজী প্রাণিসমূহ। এদের সবার জৈব ক্রিয়া বিক্রিয়ার সম্মিলিত যোগফল দাঁড়াবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে যে সব জৈব গোষ্ঠী বাস করে তারা ঐ পরিবেশের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য দিতে পারে। এক একটি জীবগোষ্ঠী এক এক ধরনের পরিবেশে অভ্যস্ত। কোন্ গোষ্ঠী কোন্ পরিবেশে বাস করে এ জ্ঞান থাকলে কেবল চিহ্নিত গোষ্ঠীর উপস্থিতিই ইঙ্গিত দিয়ে দেবে পরিবেশের প্রকৃতির (আকর সূত্র—মিশ্র (১৯৬৪), মেহের হোমজি (১৯৭২), সাগর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৫), জাকা ইমাম (১৯৭৫), বেনসন (১৯৬৭), এস আর ভর্মা (১৯৭১) ঃ

৬নং সারণী

ইঙ্গিত	ইঙ্গিতকারী উদ্ভিদ
ভূমিক্ষয়	ক্যারিসা স্পিনারাম ও ক্যাপ্পারিস সেপিয়ারিয়া নামক উদ্ভিদের উপস্থিতি।
পলি সঞ্চয়	জিজাইফাস রোটাণ্ডি ফেলিয়ার উপস্থিতি।
সাম্প্রতিক বন্যা	আর্গেমনের উপস্থিতি।
ক্ষারধর্মী মাটি	ক্লোরিবাণ্ডা ও ক্লোরিস ভিরগাটা
ভূগর্ভ জল	অ্যাকাসিয়ার চারা বা জুলিফ্লোরা
লোনা জল	আর্টিপ্লেন, সালসোলা
জলের কাঠিন্য	হাইড্রিলা ভারটিসিল্লাটা
ভূগর্ভে তামা, সীসা ও দস্তার অস্তিত্ব	ওয়ালথেরিয়া ইণ্ডিকা স্টেরকুলিসিয়া নামক গাছ (সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদদের আবিষ্কার)।
ভূগর্ভে লোহার অস্তিত্ব	স্পারমাকোসি স্ট্রিকটা
আগ্নেয় শিলা	বেটুলা গাছ, অলমাস্টার বৃক্ষ
চুনাপাথর	লারিক্স, সাবিনা, ভার্জিনিয়া

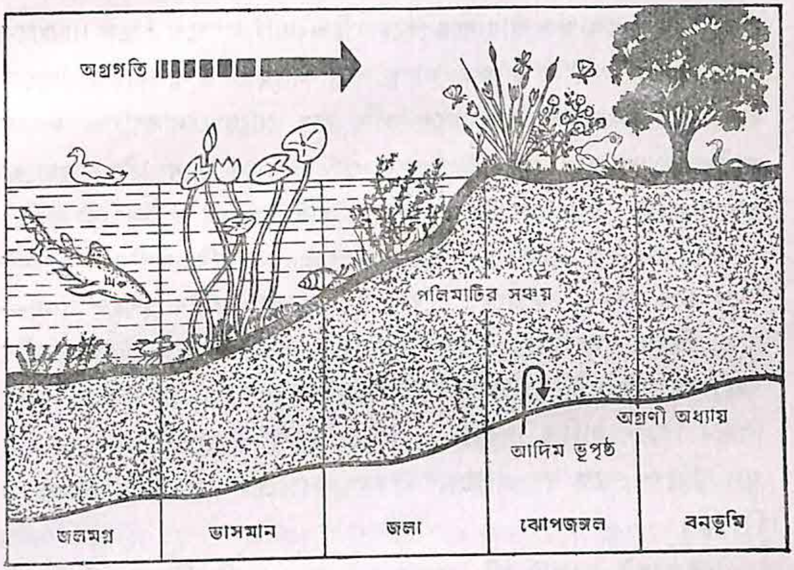
এ ছাড়া বায়ু ও জল দূষণের নানা ইঙ্গিত বহন করে একাধিক উদ্ভিদ ও প্রাণী। দূষিত বায়ু প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদের বাড় ও জননক্রিয়াকে কমিয়ে দেয় ও পরে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে গাছের গায়ে ক্ষত চিহ্নের সৃষ্টি হয়। দূষিত জলে পাওয়া যায় চারা ও ওলফিয়া শ্রেণীর উদ্ভিদ। কিছু কিছু প্রাণীও পরিবেশ দূষণের ইঙ্গিত বহন করে। যেমন, মাটিতে ফুসিলিনিড নামক প্রটোজোয়ার উপস্থিতি ভূতলে খনিজ তৈলের ইঙ্গিত দেয়। স্থির জলে নালা-নর্দমার ময়লার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে ডায়াটমের (অ্যালজি) হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই ধরনের দূষণ বৃদ্ধি পেলে চিরনয়েডের লার্ভা ও কীটাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শিল্প আবর্জনা জল দূষিত করলে কাতলা, বাটা, রুই প্রভৃতি মাছেরা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সব লক্ষণ বিচার করে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক ভাবে স্থির করেন কোন্ পরিবেশ নির্মল ও কোন্ পরিবেশ দূষিত।

জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম হল প্রাণহীন এলাকা অধিকার করে সেখানে ছড়িয়ে পড়া। দেখা যায় এই ধরনের প্রাণহীন এলাকায় অনুপ্রবেশের ও অভিপ্রয়াণের ক্ষেত্রে এক ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী অন্যদের থেকে **অগ্রণী** (Pioneer) হিসাবে দেখা দেয়[৪]। এই সব অগ্রণী ওই এলাকায় মৌরসী পাট্টা গাড়লে অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীরা তাদের পিছু পিছু অধিকৃত এলাকায় ঢুকে ভিড়ের চাপে অগ্রণীদের সরিয়ে দিতে শুরু করে। এই ভাবে অধিকৃত এলাকার পরিবেশে একটানা জৈব পরিবর্তন হতে থাকে। এই পরিবর্তন ক্রমের নাম **পরিবেশ পারম্পর্য** (Ecological Succession)। এই পারম্পর্য হতে পারে দুই ধরনের :

১. আরম্ভকালীন ও ২. পৌনঃপুনিক।

কোন প্রাণহীন অঞ্চলে প্রাণের প্রথম প্রতিষ্ঠাকে বলা হয় আরম্ভকালীন পারম্পর্য এবং কোন অঞ্চল প্রাকৃতিক কারণে (যেমন পুকুর শুকিয়ে যাওয়া, দাবানলে বন বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি) প্রাণহীন হয়ে পড়ার পর প্রাণের নতুন অঙ্কুরোদ্গমকে বলে পৌনঃপুনিক পারম্পর্য। পারম্পর্য একটি বিরাম-বিহীন পদ্ধতি—একটি জৈব গোষ্ঠীর বিদায়ে আর একটি জৈব গোষ্ঠীর পরিবেশ অধিকার ও যথাকালে আর একটি জৈবগোষ্ঠীর হাতে পরিবেশের অধিকার তুলে দিয়ে মহাপ্রস্থান। এই পারম্পর্য শুরু হয় পুকুরের বা হ্রদের জলে যার নাম জল-স্থাপত্য (Hydra-arch)। পারম্পর্য গত বিবর্তনের ছটি অধ্যায় (১৫ নং নকশা)[৫] :

১. **অগ্রণী অধ্যায়** (Pioneer Stage)—মানুষের তৈরী নতুন খাল-বিল-হ্রদের উদ্ভিদবিহীন ন্যাড়া তলদেশে জন্মাতে শুরু করে অ্যালজি, ব্যাক্টেরিয়া জাতীয় উদ্ভিদ কণা ও অ্যামিবা জাতীয় এককোষী প্রাণী। এদের বলা যায় অগ্রণী জীব।



নকশা নং-১৫

২. **জলমগ্ন অধ্যায়** (Submerged Stage)—জলের গভীরতা ছয় মিটারের মধ্যে। 'এল' ঘাস, চারা (অ্যালজি), জলজ আগাছা, ঝাঁঝি, হাইড্রিলা ইত্যাদি বহুকোষী উদ্ভিদ ও শামুক, কেঁচো জাতীয় বহুকোষী নিম্নপ্রাণী। এদেরও অগ্রণী জীবের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

৩. **ভাসমান অধ্যায়** (Floating Stage)—জলের গভীরতা ২।২½ মিটার। ভাসমান পানা জাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে শালুক, পদ্ম ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ যার ফুল ও পাতা জলের উপরে ভেসে থাকে, শিকড় থাকে জলের ভিতর মাটিতে গাঁথা। শামুক, ঝিনুক, সাইক্লোপ ইত্যাদির সাথে সাথে দেখা দেয় বহুতর জলচর কীট, সরীসৃপ ও ক্রমে নানা শ্রেণীর মাছ। গভীরতা কমছে জৈব আবর্জনায়।

৪. **জলা অধ্যায়** (Reed Swamp Stage : ৬ নং চিত্র)—জলের

গভীরতা ১ মিটার বা তার কম। উদ্ভিদ বলতে ঘন নিবিড় ভাবে অঙ্কুরিত নল খাগড়ার ঘেসো জঙ্গল। গভীরতা কমে আসার সাথে সাথে কমে আসছে মৎস্য-সমাজ। গভীরতা দ্রুততর কমছে জৈব আবর্জনা ও চারপাশের বৃষ্টি ধৌত মাটি দিয়ে।

৫. **ঝোপ-জঙ্গল অধ্যায়** (Wood Land Stage : ৭ নং চিত্র)—মাটির উপর থেকে জল প্রায় সরে গেছে যদিও মাটি সপসপে ভিজে। স্থানে স্থানে কয়েক সেন্টিমিটার জল আবদ্ধ হয়ে আছে। জলা মাটির উপযুক্ত ঘাস ও ঝোপঝাড় জাতীয় জঙ্গলে ভর্তি হয়ে আছে এলাকাটি। জলচর প্রাণীরা অদৃশ্য হয়ে গেছে। উভচর প্রাণীর সাথে এসে ভীড় জমাচ্ছে স্থলচর সরীসৃপ ইঁদুর খরগোস জাতীয় ছোটখাট মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী।

৬. **বনভূমি অধ্যায়** (Forest Stage)—জমির জলীয় ভাব কেটে গিয়ে তার উর্বরতা বেড়েছে। দেখা দিয়েছে বৃক্ষ শ্রেণীর স্থলচর উদ্ভিদ—শাল, শিমুল, মেহগিনি, দেওদার, এলম, ওক। এসেছে উন্নত শ্রেণীর বৃহদাকার বন্যপ্রাণী—চিতাবাঘ, শেয়াল, হরিণ, ঘোড়া ইত্যাদি। এদের পিছনে পিছনে হাজির শিকারী ও কাঠুরে মানুষ। এই খানেই শেষ হল জল-পরিবেশ থেকে স্থল পরিবেশে উত্তরণ এবং সেই সঙ্গে জৈব পারম্পর্যের বিবর্তন।

এই নবসৃষ্ট বনভূমি যদি ভারতে হয় তা হলে কি কি বন্যপ্রাণী গোষ্ঠী সেখানে আস্তানা নিতে পারে সেই আলোচনা দিয়ে শেষ হবে 'জৈবসমাজ ও প্রাণিসংখ্যা' অধ্যায়। **ভারতের প্রধান প্রধান বন্যপ্রাণী** হল বাইসন, চিত্রল হরিণ, জলার হরিণ, কস্তুরী হরিণ, সাম্বার, হাতি, বন্য শূকর, হনুমান, কৃষ্ণমৃগ, বাঘ, চিতা, সিংহ, সাদা বাঘ, বাঁদর, গণ্ডার, কালো ভাল্লুক, বন্য ভেড়া ও ছাগল, বুনোমোষ, স্বর্ণ মার্জার, পেলিকান, গোলাপী হেরন, বক ও বুনোহাঁস[৬]।

ভারতে নয় জাতের হরিণ পাওয়া যায়—কস্তুরী, কোটরা, চিত্রল, হগিরান, সাম্বার, বড়-সিংহ, থামিন, কাশ্মিরী ও সাঙ্গাই। কস্তুরী পাওয়া যায় মূলত হিমালয়ের উঁচু অংশে। সংখ্যার দিক দিয়ে বিশালাকৃতি সাম্বারই সবচেয়ে বেশী। এই সুন্দর নিশাচর প্রাণীটিকে ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। বাইসন বা মিথুন পাওয়া যায় হিমালয়ে এবং কর্ণাটকে। বাইসন ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ভারত থেকে। বুনোমোষ পাওয়া যায় গাঙ্গেয় সমতল,

তরাই ও আসামের জঙ্গলে। কৃষ্ণসার মৃগরা চার রকমের—চৌ, নীলগাই, গ্যাজেল ও কৃষ্ণসার। হিমালয়, বুন্দেলখণ্ড, দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায় এই সব মৃগবাহিনী। বন্য মার্জারশ্রেণীর মধ্যে পড়ে বাঘ (নিশাচর এই প্রাণীর সংখ্যা ২৫০০০ থেকে ৩০০০এ নেমে এসেছিল বলে ভারত সরকার ৮টি সংরক্ষিত বনে চালু করেছেন ব্যাঘ্র প্রকল্প অন্তর্গত অভয়ারণ্য), চিতা (পাওয়া যায় ভারতের সর্বত্র) এবং বন বেড়াল। শীতঘুমে অভ্যস্ত ভাল্লুকরা হিমালয়ের মধ্যম উচ্চতায় বাস করে। ভারতীর সিংহ জগৎ-বিখ্যাত। যদিও একদা ভারতের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যেত আজ একমাত্র কাথিয়া-ওয়াড়ের গীর অরণ্যেই এদের আশ্রয়। এক শৃঙ্গী গণ্ডারের আবাস হিমালয়ের পাদদেশে, পশ্চিম বঙ্গের সমতলে ও আসামের জঙ্গলে। সিংহের মত জলহস্তিও অবলুপ্তির পথে। হাতি পাওয়া যায় হিমালয়ের পাদদেশে ও তরাই অঞ্চলে।

ভারতে পাখী পাওয়া যায় ১২০০ শ্রেণীর। ময়ূর, হাঁস, পায়রা, বক, পেলিকান, স্বর্ণ ঈগল, সারস, প্যাঁচা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ভারতের বেশ কিছু পক্ষী প্রজাতিও ক্রমে দুর্লভ হয়ে উঠছে।

জলজ প্রাণীর মধ্যে প্রধান কুমীর ও ঘড়িয়াল। নিবাস উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন। গুরুতর অবলুপ্তির পথে যাওয়ায় সংরক্ষণার্থে সরকার ১৯৭৪ সালে চালু করেছেন কুমীর প্রকল্প।

উপরের এই বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে বনভূমির পরিবেশ খুব গুরুতরভাবে ভারসাম্য হারাচ্ছে। অধিকাংশ জৈব গোষ্ঠীই ক্রমাগত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। অবশ্য সরকারও এ ব্যাপারে বেশ সচেতন। যে সব পশুপাখীকে সংরক্ষিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে তার মধ্যে আছে : শ্বেতচক্ষু হাঁস, কৃষ্ণসার মৃগ, চৌশৃঙ্গী মৃগ, গোণ্ড হরিণ, প্যাঙ্গোলিন, হাতি, গ্যাজেল, কস্তুরী হরিণ, স্বর্ণ মার্জার, তাহ্‌র, সাদা চিতা, অ্যালবিনো, বাস্টার্ড, গোলাপী-মাথা হাঁস, বিভিন্ন শ্রেণীর ময়ূর, কুমীর, ঘড়িয়াল, পাইথন সাপ ও কয়েক শ্রেণীর পিচ্ছিল কচ্ছপ। ভারতে প্রায় ২০০ সংরক্ষিত বন রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় স্তরে উল্লেখযোগ্য হল কাজিরঙ্গা, মানস, পালামৌ, হাজারীবাগ, দক্ষিণ গোয়ার কোটিগাঁও, গির, সুলতানপুর লেক, বান্দিপুর, পারিয়ার, কান্‌হা, সিমলিপাল, চিল্‌কা, পাতিয়ালা—মোতিবাগ, ভরতপুর, করবেট পার্ক ও জলদা পাড়া[৭]।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম জনসংখ্যা বাড়ছে বিস্ফোরণের আকারে অথচ পরিবেশের অন্যান্য জৈব গোষ্ঠী—তৃণ, উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী কমে কমে হতে চলেছে নিশ্চিহ্ন। এরকম অবস্থায় পরিবেশ ভারসাম্য হারাতে বাধ্য। এই দূষণের পয়লা শিকার হবে কিন্তু স্ফীতকায় মানবগোষ্ঠী।

মৃত এক মহাদেশ
বার বার করি আবিষ্কার!
তার নদী, প্রান্তর, পাহাড়
কতবার জীবনের ছক পেতে সাজিয়েছে খেলা,
মাৎ হয়ে গিয়ে শেষে
কোন এক অনির্ণেয় চালে,
মহাবিলুপ্তির দণ্ড
মাথা পেতে নিয়েছে অকালে।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

সেই দণ্ড আমাদের শিরে নামবার আগেই খুঁজে বার করতে হবে বাঁচবার পথ।

---

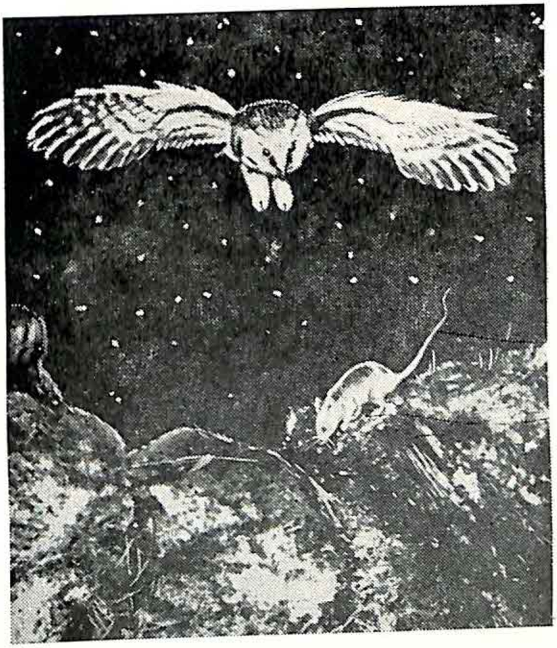
১. কোট পাল ও বালি ২. সলিল লাহিড়ী ৩. এম. এ. মজুমদার ৪. তারকমোহন দাস ৫. ৬. এবং ৭. কোটপাল ও বালি।

দ্বিতীয়াংশ

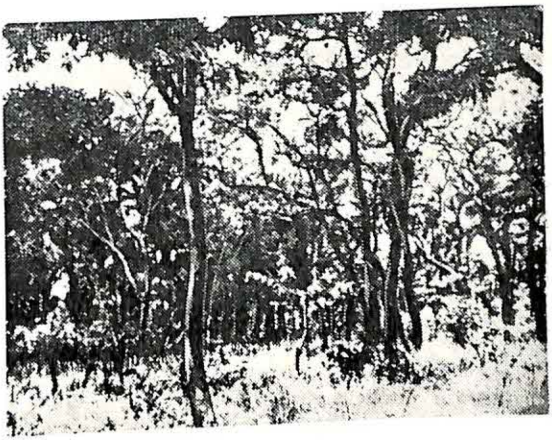
দূষণ ও সংরক্ষণ

…এই হ্রদ পর্যটক একদিন খুঁজে পায় যেই,
বন্দুকের শব্দে ওঠে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ;
শিকারের তাজা রক্তে শুচি শিলা শিহরে সহসা,
আগুনের লোল জিহ্বা খোঁজে গূঢ় সত্তার ধমনী।

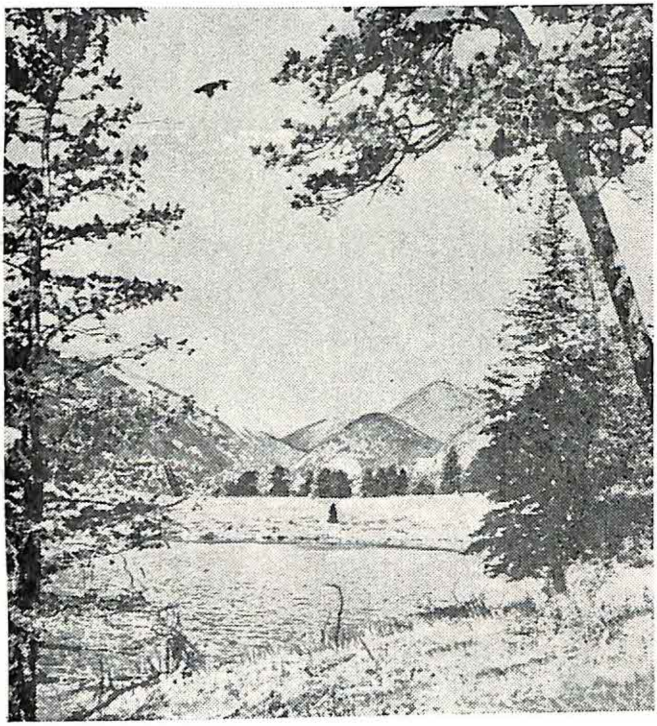
—প্রেমেন্দ্র মিত্র



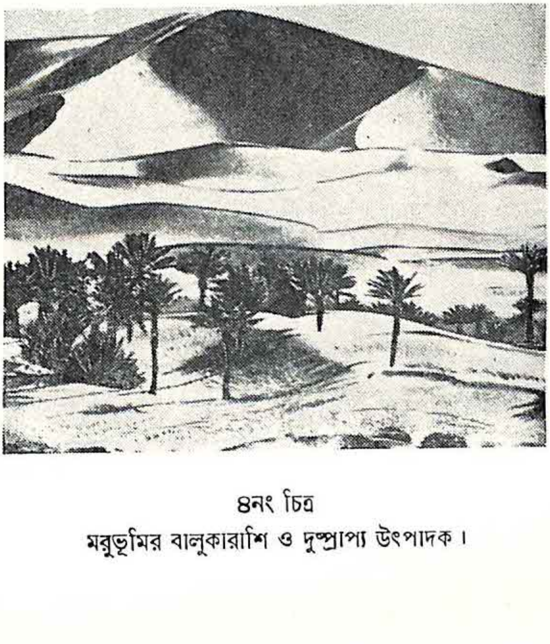
১নং চিত্র
তৃণভোজী ও মাংসাশী গ্রাহক—ইঁদুর ও পেঁচা।



২নং চিত্র
পর্ণমোচী বনভূমির উৎপাদক মণ্ডল।



৩নং চিত্র
জলা ও তৃণভূমির উৎপাদক মণ্ডল।

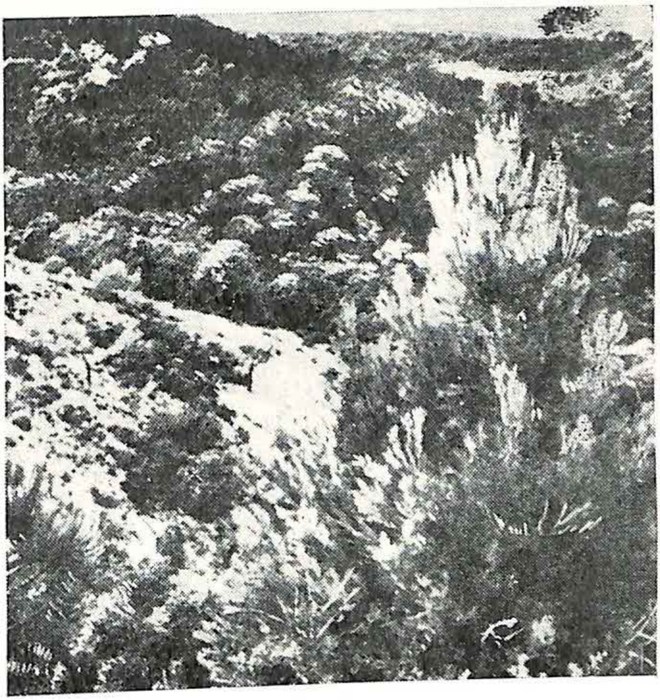


৪নং চিত্র
মরুভূমির বালুকারাশি ও দুষ্প্রাপ্য উৎপাদক।

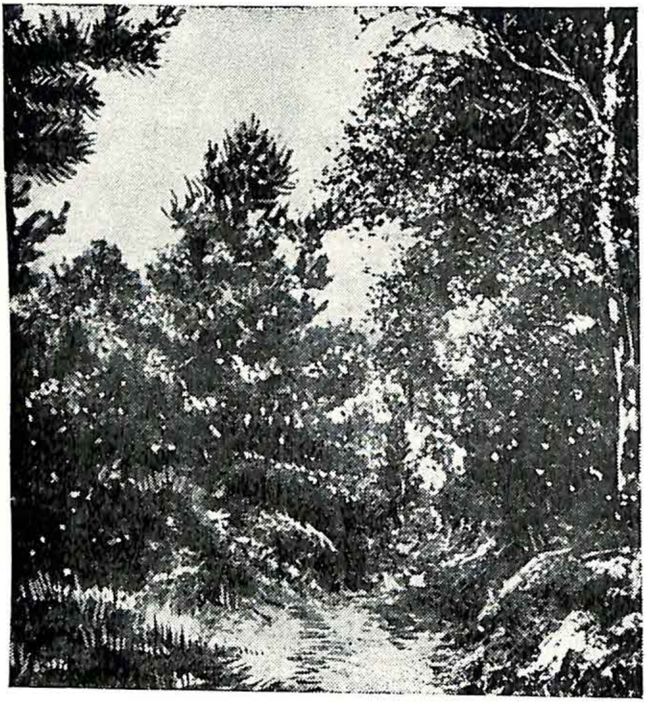


৫নং চিত্র

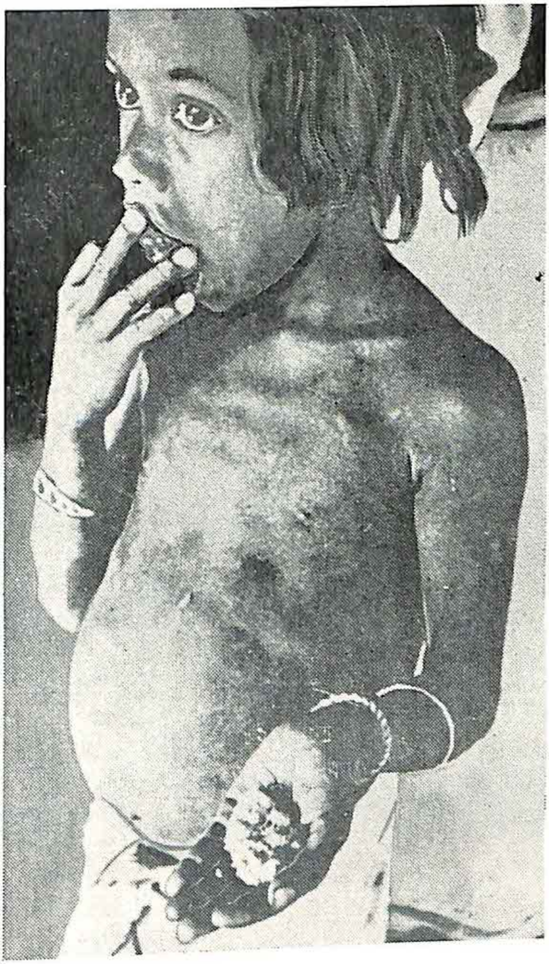
আনবিক বিস্ফোরণে উদ্ভূত তেজষ্ক্রিয় আবর্জনা।



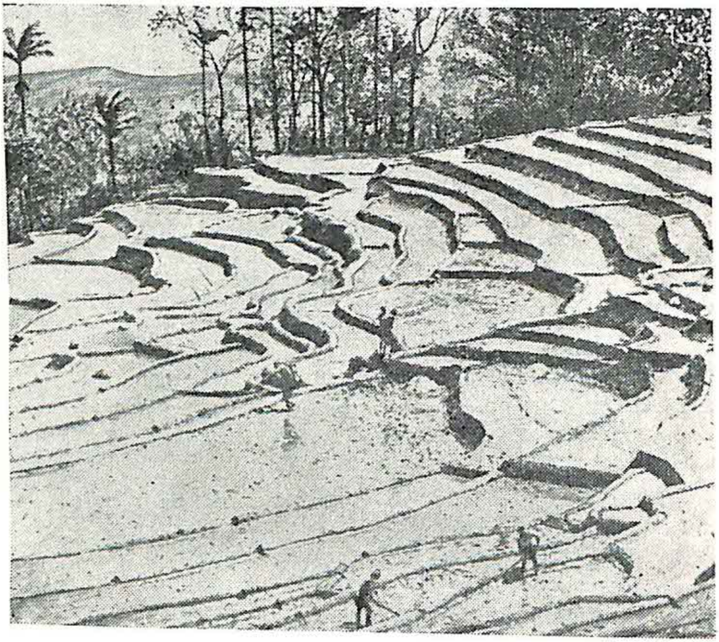
৬নং চিত্র
জলা অধ্যায়—গভীরতা এক মিটারের মত।



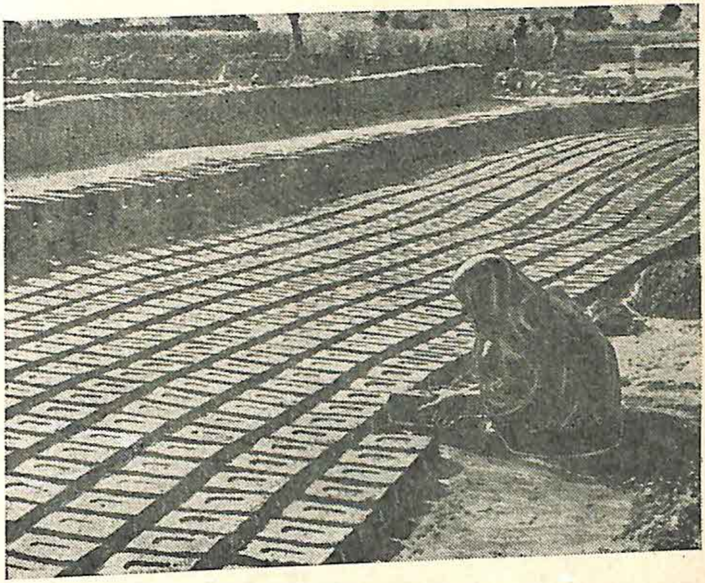
৭নং চিত্র
ঝোপজঙ্গল অধ্যায়—জল সরে গেছে তবু মাটি ভিজে ।



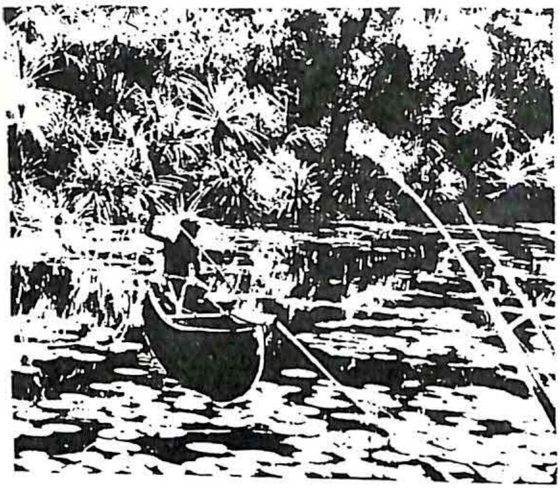
৮নং চিত্র
বাচ্চাটি ডি. ডি. টি. মিশ্রিত আলুর মণ্ড খাচ্ছে।



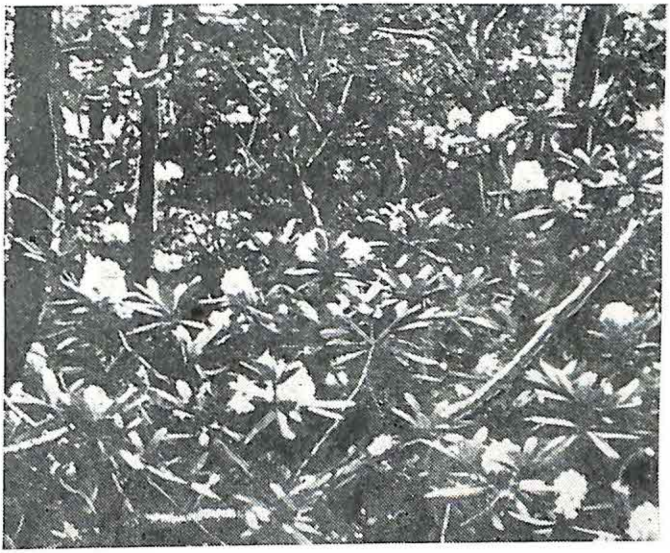
৯নং চিত্র
কনট্যুর ফার্মি পাহাড়ী ঢালের সমান্তরালে চাষ।



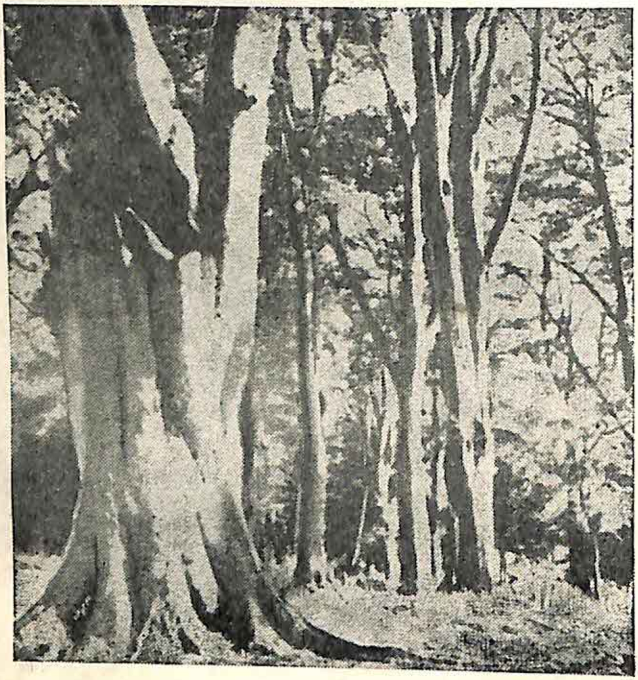
১০নং চিত্র
ইটভাঁটার মারফৎ ভূমিক্ষয়।



১১নং চিত্র
লবণাক্ত জলাভূমিতে মাছধরা ।



১২নং চিত্র
চিরহরিৎ উপবন ।



১৩নং চিত্র
পর্ণমোচী বৃক্ষের উপবন।

কিশোর মানবক গাছ থেকে ফল পাড়ত, খেত, ডাল ধরে দুলত, খেলত সারা দুপুর ধরে। হঠাৎ আসা যাওয়া গেল কমে। আর সে আসে না। কেটে গেল একটা যুগ। তার-পর একদিন ফিরে এল যুবক মানবক। হাতে তার কুড়ুল। টাকার দরকার। ডাল কেটে বিক্রি করবে। 'তা বেশ তো নাও না' গাছ বলল, 'আমি কিছু মনে করবো না।' আবার এক যুগ। নিঃসঙ্গ গাছের কাছে এসে দাঁড়াল মধ্যবয়স্ক মানবক। চোখ লাল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, হাতে এবারও কুড়ুল, সঙ্গে একটা ঠেলা গাড়ী। গাছের কাছে জানাল মানবক—সে বিয়ে করেছে। সে একটা বাড়ী বানাতে

৫ দূষণ ঃ ভারতে, বাংলায়
Pollution in West Bengal & India

চায়। তাই সে···এ তো সুখের কথা, গাছ বিসর্জন দিল তার ডালপালা। বাকী রইল ন্যাড়া কাণ্ড। আবার এক যুগ বাদে এসে প্রৌঢ় মানবক চেয়ে বসল কাণ্ডটা। বাণিজ্যে যাবে, নৌকা বানাবে। ভূবন ভ্রমণ শেষে আর এক যুগ বাদে গাছের কাছে ফিরে এসেছিল বৃদ্ধ, প্রায় অন্ধ মানবক। হাতে তার একটা লাঠি। পিঠ কুঁজো। গাছ বলল তোমাকে দেবার মত তো কিছুই নেই। মরা গুঁড়িটায় একটু বসতে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল মানবক। 'আমি বড় ক্লান্ত।' গুঁড়িটার গা থেকে বেরিয়েছিল ছোট্ট নতুন একটা চারা, আলতো করে তার কচি পাতা বোলাল বৃদ্ধের গায়ে।

হুগলী জেলার মগরা, ধনেখালি, তারকেশ্বর, হরিপাল, পোলবা এবং পাণ্ডুয়াতে বেআইনীভাবে বিনা লাইসেন্সে ইটভাঁটা ও বালিখাদ বানান হচ্ছে। বেআইনী বালিখাদের জন্য চাষের জমি বালিখাদের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। রেলপথ ও জি. টি. রোডের অংশবিশেষ ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। প্রতি বৎসর সরকার হারাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ টাকার রয়ালটি, লাইসেন্স ফি। সমগ্র হুগলী জেলায় বালি তোলার মাইনিং লিজ আছে ৩২টি কিন্তু বালিখাদের সংখ্যা কম করেও ১৫০টি। অর্থাৎ বেআইনী খাদ আইনসম্মত খাদের সাড়ে তিন গুণেরও বেশী। আইনতঃ কিছু জমিতে কখনই বালি তোলার অনুমতি দেওয়া হয় না। যেমন, কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলাপমেন্টের এলাকাধীন জমি, রেল লাইন, ষ্টেশন ও রাস্তার ৪৫ মিটার দূরত্বের মধ্যের জমি ইত্যাদি। কিন্তু বেআইনী খাদের এসব আইন-কানুন মানার প্রশ্ন ওঠে না। একমাত্র পাণ্ডুয়াতেই সংখ্যা ২৩। সরকারকে ফাঁকি দিতে এরা পুকুর সংস্কারের নামে বালি তোলার অতি লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসেন।

মগরা পাণ্ডুয়া অঞ্চলের খবরটা একটা টুকরো খবর। সারাদেশে এইভাবে চলেছে ভূমিনাশ ও ভূমিক্ষয়ের মারণ যজ্ঞ। গঞ্জাম জেলার ৪টি ছোট নদী থেকে বালি তোলার ব্যাপারে উড়িষ্যা সরকারের জল-বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে বলা হয়েছে অত্যধিক বালি তোলার ফলে জলের সীমারেখা ক্রমশ কমছে ও স্থানে স্থানে চড়া পড়ে যাচ্ছে। এতে জল পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে অতি দ্রুত। এই জাতীয় কোন বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের বরাকর-দামোদর বেসিনের অবস্থাও একই।

বনবিভাগের পরিবেশ সংক্রান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের সাড়ে ৩০ কোটি হেক্টর জমির মধ্যে সাড়ে ১৭ কোটি হেক্টরে ছড়িয়ে পড়েছে ভূমিদূষণ। অর্থাৎ আমাদের সাড়ে ৫৭ শতাংশ জমি জলবন্দী, লবণাক্ত, বাৎসরিক বন্যার ফলে বালুচাপা, ক্ষারধর্মী বা অম্লধর্মী—কোনরকম ফলনেরই অনুপযুক্ত। কৃষি ও বনভূমির এই ক্রমাগত অবক্ষয়ের ফলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রগতি মার খাচ্ছে দারুণ ভাবে। ভারতের ভূমিমানের করুণ ছবিটা ফুটে ওঠে যখন আমরা জানতে পারি আমাদের মোট জমির ২২·৮ শতাশ বনভূমি (যা

হওয়া উচিত ছিল ৩৩ শতাংশ), ৪৭ শতাংশ কৃষি জমি (পৃথিবীর সর্বোচ্চ শতকরা হার), ৩০·২ শতাংশ অনুর্বর আগাছাপূর্ণ ! রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর নির্বাহী নির্দেশক সম্প্রতি ক্ষুব্ধভাবে বলেছেন যে ১৯৭২-এ স্টকহলমে পরিবেশ সংরক্ষণের যে যৌথ পথ নিয়েছিলেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা, বহুদেশ সেই পথের নির্দেশিত কার্যক্রমকে এতদিন ধরে গুরুত্ব না দেওয়ার ফল জমির এই ভয়াবহ অবক্ষয়। ভারতের পরিবেশ মন্ত্রী কিছুদিন আগে বলেছেন যদি জনগণ এগিয়ে না আসেন পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচীর সুষ্ঠু রূপায়ণ একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দেশবাসীকে এ কাজে আগ্রহী করতে হলে যে উদ্যোগ দরকার তাও সরকার এখানো গড়ে তুলতে পারেন নি।

কৃষিতে কীটনাশক ও অজৈব রাসায়নিক সার ক্রমাগত ও দীর্ঘকাল প্রয়োগের ফলে মানুষের দেহ, প্রাণিজগত, খাদ্য, পরিবেশ ও জলে বিষক্রিয়া হচ্ছে। এমন বহু কীটনাশক আমরা এদেশে হামেসাই ব্যবহার করছি যার ব্যবহার উন্নত দেশগুলিতে বহু আগেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ এস. বি. চ্যাটার্জীর মতে কীটনাশক থেকে বছরে পাঁচলক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যার একটা বড় অংশ মারাও যাচ্ছে এই কারণে (১৯৫৮-তে কেরলে ইথাইল প্যারাথিয়ন ব্যবহারে বহুলোকের মৃত্যু হয়)। এছাড়া কীটনাশক ব্যবহারে উদরাময়, অবসাদ, সাময়িক পঙ্গুত্ব, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন প্রভৃতি রোগ প্রায়ই দেখা যায়। এদেশে বাৎসরিক কীটনাশক ব্যবহৃত হয় ৪ লক্ষ টন। ফল কি জানেন ? বিভিন্ন দেশে মানবদেহে সঞ্চিত ডি. ডি. টি.র হিসাবটা শুনুন[১] (৮নং চিত্র) :

অ্যামেরিকা/ক্যানাডা	—	দশলক্ষে ২-৪	ভাগ
ইউরোপ	—	৬-৮	”
ইজরায়েল	—	১৯	”
ভারত	—	২৬	”

গত ৫ বছরে পশ্চিমবাংলায় কীটনাশকজনিত মৃত্যু হয়েছে ৮৮৯। এ বিষ আসছে পানীয় জল, মাছ-মাংস, শাক-সবজি, দুধ, মাখন, তেল থেকে। শেষোক্ত চারটি পদার্থে দিল্লীর নমুনা সমীক্ষায় সর্বক্ষেত্রে ডি. ডি. টি. পাওয়া গেছে বিপদ-সীমার উপরে। এই সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে রাসায়নিক সার। ১৯৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাসায়নিক সার শিল্প বেড়ে গেছে বারো গুণ! এই

সার মাটিকে ক্রমে ক্ষারধর্মী করে চাষের অযোগ্য করে তুলছে। সাথে মিতালী পাতাচ্ছে গভীর নলকূপ থেকে তোলা সেচের জল। উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষে যে জলসেচের প্রয়োজন তার বিপুল চাহিদা বৃষ্টি বা সেচ খালের পক্ষে মেটান সম্ভব নয়। তাই সৃষ্টি হয়েছে গভীর নলকূপের। জলের সঙ্গে পৃথিবীর তলদেশ থেকে উঠে আসছে বিষাক্ত ধাতু, লবণ ও অ্যাসিড। মাটির বুকে সঞ্চিত হয়ে তা কৃষিজমিকে দূষিত করে তুলছে খুব তাড়াতাড়ি।[২]

জল বিদ্যুৎ বা সেচের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে বেশ কিছু বাঁধ দেওয়া জলাধার। এগুলি আশেপাশের ভূতল জলস্তরকে উঁচুতে তুলে দিচ্ছে। মাটি হয়ে উঠছে স্যাঁতস্যাতে। ফসলের গোড়া পচে যাচ্ছে। ক্ষেত থেকে সরতে চায় না সেচের জল। এও এক ধরনের ভূমিক্ষয় যাতে উর্বর চাষের জমি পরিণত হচ্ছে অনুর্বর জলাতে। জলাধারগুলিতে পলি জমাও হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুতহারে। বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন ডিভিসির জলাধারে বছরে পলি জমবে ৩৪ একর ফুটের মত। পলি জমার প্রকৃত হার বছরে ৩০০ একর ফুটের মত[৩]। হিমালয়ের ভঙ্গিল পাললিক শিলার জন্য বৃষ্টির প্রাবল্যে দেশের সব বাঁধে জমা বাৎসরিক পলির পরিমাণ দিয়ে ৬ মিটার উঁচু, ১½ মিটার পুরু একটি দেয়াল তৈরী করা যায় হিমালয়ের পাদদেশ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত। এই জমা পলি জলাধারের নাব্যতাকে কমিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার পরিধি। নিত্যনতুন জমি পড়ছে জলের কবলে। বাড়ছে বন্যার প্রকোপ, ভূমিক্ষয়।

এরপর রয়েছে **শহরাঞ্চলের ভূমিদূষণ**, যা ঘটছে পৌর আবর্জনা থেকে। শহরের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য পদার্থের অবশিষ্টাংশ, বাজারের আবর্জনা, রাস্তার ধুলো-বালি যা রাস্তার পাশের কাঁচা পাকা ড্রেনে এসে পড়ছে, সেই সব শক্ত পদার্থ নিয়েই হয় আবর্জনা (Refuse)। আবর্জনা পথের পাশ থেকে সরিয়ে না ফেল্লে তা পচে বাতাস দূষিত করে তোলে। সরিয়ে ফেল্লেও যদি এ স্তূপকে নিয়ন্ত্রিত না করা হয় তা হলে সেখানেও শুরু হবে বাতাস দূষণ। আবর্জনার মধ্যে জৈব ও অজৈব—দুরকম পদার্থই থাকে। জৈব পদার্থ পচে দুর্গন্ধ ও মশা-মাছির মারফত কলেরা, ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড রোগ বিস্তার করে। আর অজৈব আবর্জনা আশেপাশের কৃষি জমিকে করে তোলে দূষিত। আবর্জনা আসে তিন জায়গা থেকে—গৃহাঞ্চল

(তরিতরকারীর খোসা, মাছ-মাংসের নাড়িভুঁড়ি, ছাই, ঘেঁস, বাড়ীভাঙ্গা রাবিশ, বিষ্ঠা) ; পথঘাট (ধুলো-বালি, কাদা, পলি, ডাবের খোলা, পাতা, কাগজ, যানবাহনের পরিত্যক্ত পদার্থ) ; কলকারখানা (নানারকম জৈব ও অজৈব শিল্প আবর্জনা)।

কোলকাতার প্রতিদিন জনপ্রতি আবর্জনার পরিমাণ ১·৪৫ কেজি যার অর্ধেকটা সরানো হয়, বাকিটা জমে থাকে শহরেই। বৃহত্তর কোলকাতার আয়তন ১৩৬৮ বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা শীঘ্রই ১ কোটি হতে চলেছে। ২০০০ সালে বেড়ে হবে দেড় কোটি। কোলকাতার আশেপাশের নিচু জলা জমি ভরা হয় এই আবর্জনা দিয়ে। তার ফলে এই সব জমিগুলিতে নানারকম বিষাক্ত অজৈব পদার্থ মিশে গেছে এবং যাচ্ছে। জমি লবণাক্ত হয়ে উঠছে ; হেরফের হচ্ছে তার পি. এইচ. মানের[৪]।

ভূমি দূষণের পরেই স্বাভাবিকভাবে আসে **জল দূষণ**। জল দূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় বোর্ড সম্প্রতি সতর্কতামূলক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে গঙ্গার জলকে দূষিতকরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী নীতি গ্রহণ করা দরকার। না হলে গঙ্গার ভবিষ্যত ও তীরবর্তী শহরগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন অচিরেই বিঘ্নিত হবে। দামোদরেও দৈনিক ৩ লক্ষ গ্যালন আবর্জনা ঢালা হচ্ছে, বেশীর ভাগই কারখানার অজৈব ময়লা। কল্যাণী থেকে বিড়লাপুর—হুগলী নদীর দুধারে রয়েছে মোট ৫৭টি বড় শিল্প (পাটকল—৩৪, পেপার মিল ও কাপড়ের মিল—১০টি ; ডিস্টিলারী ও রং কারখানা—২টি করে ; রেয়ন মিল, চিনিকল ও চামড়া শিল্প—১টি করে ; তারশিল্প—২টি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র—৪টি)। এই অংশে ওয়াটার ওয়ারকস রয়েছে ৬টি (পলতা, শ্রীরামপুর, কামারহাটি, উত্তরপাড়া, গার্ডেনরীচ দক্ষিণ ও উত্তর)। এই অঞ্চলে প্রতিদিন হুগলী নদীতে ২০৭৫·৭ টন আবর্জনা পড়ছে। এর মধ্যে গৃহজাত আবর্জনা—১৩৬·২ টন ; শিল্পজাত—২৭৬·৯ টন ; নালাজাত—১৩৯২·৫ টন ও অন্যান্য—২৭০·১ টন। মিরাট ডি. এন. কলেজের অধ্যাপক ভি. পি. কুড়েসিয়া ভারতের ২১টি নদনদী থেকে জলের স্যাম্পেল নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। পরিবাহিত মোট আবর্জনার হিসাবে কোলকাতা ও হাওড়া সংলগ্ন হুগলী নদীই ভারতের সবচেয়ে দূষিত বহমান জলধারা। হিসাবটি প্রতি লিটার জলে কত মিলিগ্রাম আবর্জনা আছে তার অঙ্ক, জল কতটা

ঘোলা, তার পি. এইচ. মান ও বি. ও. ডি. (জৈবিক প্রক্রিয়ায় কতটা অক্সিজেন প্রয়োজন—প্রতি লিটার জলে মিলিগ্রামে তার হিসাব) ঃ

৭নং সারণী

নদীর নাম	মোট আবর্জনা	ঘোলাভাব	পি. এইচ. মান	বি. ও. ডি
গড়মুক্তেশ্বর গঙ্গা	১৮৮	১'২	৭'৯	২'২
সোলানি	২১৫	৬ ২	৭'৪	১১'০
ভোলা প্রপাত	২০৪	৭ ০	৭'৪	১০'০
ব্রহ্মপুত্র	২৬৮'০	৭'২	৭'৫	১৬'৭
ডাল হ্রদ	২৮৯'৬	৭'৯	৭'৭	১৮'০
তুঙ্গভদ্রা	২৪০'০	৬'২	৭'৮	১২'১
লুনি	২৪১'০	৬'১	৭'৩	১২'৭
শতদ্রু	২৪৬'০	৬'৩	৭'৪	১১'৮
রভি	২৪৯'০	৬'১	৭'৪	১২'৩
চেনাব	১৬৫'০	৭'১	৭'২	১১'৭
গণ্ডক	২৭৫'০	৭'১	৭'৫	১৭'০
ঝেলাম	২৮৩'০	৭'৫	৭'৬	১৯'২
তাপ্তি	২৩২'০	৭'৬	৭'৮	১৪'১
নর্মদা	২৪৯'০	৭'৬	৭'৮	১৪'৮
গোদাবরী	২৩৯'০	৭'৫	৭'৭	১৫'৮
কাবেরী	২৭৮'০	৭'৭	৭'৮	১৭'৫
যমুনা	২৮৬'১	৭'৮	৭'৮	১৭'৫
হুগলী	২৯১'০	৭'৭	৭'৯	১৫'৪

ডঃ কুড়েসিয়ার মতে হুগলীর জল এত দূষিত যে এতে কাপড় কাচাও নিরাপদ নয়। এতো গেল রাসায়নিক দূষণ। এরপর আছে জলপথে পলি জমার দরুন গভীরতা কমে গিয়ে নদীর বিস্তৃতি বেড়ে ওঠা ও নিত্যনতুন অঞ্চল বন্যার কবলে পড়া।

এক গঙ্গা নদীর অববাহিকাতেই বন্যার জন্য বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ

দাঁড়িয়েছে ২৫০ কোটি টাকা। বন্যায় মৃতের সর্বভারতীয় সংখ্যাটা দাঁড়ায় কয়েক হাজার। ৭৮ সালের বন্যায় পশ্চিমবাংলায় ভেসে যাওয়া সম্পদের পরিমাণ ১০০০ কোটি টাকা। গাঙ্গেয় অববাহিকার ৬০ শতাংশ এলাকাই বন্যার গ্রাসের আওতাভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গে নদী-প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল—১. দামোদর উপত্যকা, ২. ময়ূরাক্ষী, ৩. কংসাবতী, ৪. ফরাক্কা ব্যারেজ ও ৫. তিস্তা ব্যারেজ। দামোদর উপত্যকার বাঁধ ৪টি (তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেত) ও ব্যারাজ দুর্গাপুরে একটি। ময়ূরাক্ষীর বাঁধ ১টি (মাসাঞ্জোর), ব্যারাজ ১টি (তিলপাড়া)। কংসাবতীর বাঁধ ১টি (মুকুটমণিপুর)। ফরাক্কার ব্যারেজ একটি। পাহাড়ী নদী ব্যারেজ ১টি (তিস্তাবাজারের গজলডোবায়)। এছাড়া আছে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র জলঢাকা ও ব্রন্মাম। বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের ফলে প্রতি বছর আমরা বিপুল পরিমাণ শস্য ও সম্পদ লাভ হয়ত করছি কিন্তু পরিবেশের উপর হস্তক্ষেপের দরুন প্রতিক্রিয়া আগে থেকে বিবেচিত না হওয়ায় আমরা ডেকে আনছি নদীর মৃত্যু, প্রলয়ঙ্কর প্লাবন এবং কোলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের ধ্বংস। ফরাক্কা প্রকল্প হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনে ব্যর্থ। দেখা যাচ্ছে উচ্চ ও মধ্য প্রবাহে বন্যা নিয়ন্ত্রণ মানে নিম্ন প্রবাহে নদীর মৃত্যু। আমাদের বাঁধ ব্যারেজ মিশিয়ে ১০/১২টি জলাধার ধ্বংস করছে হুগলী থেকে মোহনা, ক্ষতি করছে নিম্ন দামোদরের। এর উপর আছে নিম্ন দামোদরের উপকূলে গড়ে ওঠা কলকারখানার অত্যাচার। নাগপুরের সি. পি. এইচ. ই. আর. আই. দুর্গাপুর উন্নয়ন এলাকায় ৭৪ সালে যে সমীক্ষা চালান তাতে প্রকাশ, দুর্গাপুরের আটটি শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রত্যহ ১৫৯১০০ ঘন মিটার আবর্জনা ঢেলে দিচ্ছে দামোদরে। তা শুষে নিচ্ছে ৪৩০০০ কেজি অক্সিজেন।

এতে মাছ মরছে মড়কের আকারে। এই আবর্জনার মধ্যে থাকছে ইস্পাত কারখানার ফ্লাইঅ্যাস, কয়লা ধোতাগারের কার্বনিক অ্যাসিড, রাসায়নিক সার কারখানার বর্জিত ক্ষার, ক্রোমেট, সাইনাইড, অ্যামোনিয়া, ফেনল ও ন্যাপথালিন। সব মিলিয়ে দামোদর ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ দূষিত নদী। এছাড়া ডি ভি সি বাঁধের পক্ষে জলাধারের পূর্ণ চাপ সামলানো অসম্ভব। ভরা বর্ষায় বাঁধ বাঁচাতে জল ছাড়ার ফলেও বন্যা হচ্ছে এবং ডুবন্ত কৃষি-জমিতে বালি বসে ক্রমাগত হচ্ছে ভূমিক্ষয়।

জলদূষণের আর এক দিক হল কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক ও আগাছা

নাশক (ডি. ডি. টি., বি. এইচ. সি., অলড্রিন, হেপ্টাক্লোর ও টোক্সাফেন জাতীয় যৌগ) বৃষ্টির জলে ধুয়ে এসে মিশছে নদীতে পুকুরে। পানীয় জল এবং জলজ উদ্ভিদ ও মাছ মারফৎ তা সংক্রামিত হচ্ছে গরুর দুধে, মানুষের শরীরে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আমাদের স্থপতিরা বাড়ী থেকে উই জাতীয় ক্ষতিকর কীট তাড়াতে এইসব বিষাক্ত যৌগ ব্যবহার করছেন যথেচ্ছ ভাবে। ভবিষ্যতে এর ফল যে কি বিষময় সে সম্বন্ধে তাঁরা মোটেই সচেতন নন। এইসব বিষাক্ত যৌগ গিয়ে জমে মানুষের দেহের চর্বিতে। যেসব দেশে ডি. ডি. টি.র বহুল ব্যবহার (বহু দেশে কিন্তু ডি. ডি. টি. ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ) সেখানে (৮নং চিত্র) মানবদেহে প্রতি দশ লক্ষ ভাগে ২৭ ভাগ পর্যন্ত ডি. ডি. টি. পাওয়া যায়। ফল—উচ্চ রক্তচাপ, টিউমার, ক্যানসার, লিউকোমিয়া, নপুংসতা ইত্যাদি। আর একটি ব্যাপারে আমাদের স্থপতি ও পূর্তবিদরা নিজেদের অজান্তে ঘটিয়ে চলেছেন জলদূষণ। সেটি হল জল সরবরাহে প্লাস্টিকের (পি. ভি. সি., ও পলিথিন) পাইপ, ভ্যালব, কল, স্ট্রেনার ব্যবহার করা। সস্তা, হালকা ও লাগানো সহজ বলে এ সবের ব্যবহার খুব বেড়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। পি. ভি. সি. পাত্রে জল বা রক্ত রাখলে পাত্র থেকে কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক যৌগ তরল পদার্থে মিশে যায়। মানবদেহে এইসব যৌগ ঠিক ডি. ডি. টি.র মত বিষক্রিয়া করে। জলে দ্রবীভূত হলে সেই জল হাড় ও চামড়ার ক্ষতি করে, স্নায়ুকে বিকল করে দৈহিক পঙ্গুতা এনে দেয়। আমেরিকার মত ভারতেরও উচিত অবিলম্বে, জলের পাইপ, খাদ্য পাত্র ও অষুধের শিশিতে পি. ভি. সি. ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

স্থপতিরা আর একটি বিষম কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন নিজের অজান্তে যা ধরা পড়েছে ১৯৭৩-এ আমেরিকান পরিবেশ সংরক্ষণ সংসদের রিপোর্টে। ছাদে, ঘরের চালায়, কারখানার দেয়ালে, ফল্‌স সিলিং ও পার্টিসান প্যানেল হিসাবে অ্যাসবেষ্টসের ব্যবহার তাঁরা করছেন প্রতিনিয়ত। এছাড়া জলের বা ধোঁয়ার পাইপ, ময়লা ফেলা স্যুট, সেপটিক ট্যাঙ্ক, জলের চৌবাচ্চা, তাপ রোধক প্যাকিং হিসাবেও ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যাসবেস্টস। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাসবেস্টসের অতি সূক্ষ্ম শোঁয়া যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না তা জলের সঙ্গে, হাওয়ার সঙ্গে ফুসফুস, পাকস্থলী বা অন্ত্রে গিয়ে সেখানে নিউমোকোনিওসিস রোগ সৃষ্টি করছে[৫]। মোদ্দা কথা, জল-হাওয়া হচ্ছে প্রকৃতির রক্ত নিশ্বাস। তাদের শুদ্ধ রাখতেই হবে আমাদের নিজেদের স্বার্থে।

পরিবেশের তৃতীয় পরিধি (Third Dimension) হচ্ছে বায়ু। এবার আমাদের আলোচ্য **বায়ুদূষণ।**

বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে আমরা জানতে পারছি :

ক. কেন্দ্রীয় পরিবেশ দফতর জাতীয় স্মৃতি সৌধগুলিকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একটি বিশেষ তদারকী গোষ্ঠী স্থাপনের কথা ভাবছেন। শিক্ষা, পর্যটন এবং পরিবেশ দফতরের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই গোষ্ঠীটি তৈরী করা হবে। জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও ঐতিহাসিক স্থানগুলির আশেপাশে খনি ও ছোটখাট শিল্প যাতে বেশি বাড়তে না পারে, সেদিকে নজর রাখা হবে প্রস্তাবিত গোষ্ঠীর কাজ। জাতীয় স্মৃতিসৌধগুলির চারদিকে সবুজ বনানী বা হরিৎ অঞ্চল (Green Belt) স্থাপনের প্রস্তাবও করা হয়েছে যাতে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা সৌধের শ্বেতপাথর ইত্যাদির ক্ষতি না করে।

খ. নয়-সদস্যবিশিষ্ট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের একটি দল চারমাস ধরে কাম্পুচিয়ার আঙ্করভাট, আঙ্করথম ইত্যাদি ৭২টি জগত-বিখ্যাত মন্দির পরিদর্শন করে এসে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে হিন্দু কিংবদন্তী ও রূপকথা থেকে রূপায়িত অপরূপ ভাস্কর্যগুলি বাতাসবাহিত সালফার, অ্যাসিড ও ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে লুপ্তপ্রায়।

গ. সানফ্রানসিসকোর খবরে প্রকাশ আগ্নেয়গিরি নির্গত ছাই, ধুলা ও রাসায়নিক বাষ্প মিলেমিশে উর্ধ্বাকাশে সৃষ্টি করছে একধরনের ধুলিমেঘের। 'নাসার' বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি ইউ-টু বিজ্ঞানের সাহায্যে উর্ধ্বাকাশে এ ধরনের এক বিস্তীর্ণ ধূলিমেঘের সন্ধান পেয়েছেন যা অদূর-ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সূর্যের আলো পৌছানয় বাধার সৃষ্টি করবে এবং তার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব পড়বে পৃথিবীর আবহাওয়ায়।

ঘ. বৃটিশ সরকারের মূখ্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সম্প্রতি এক লিখিত আবেদনে জানিয়েছেন গাড়ীর পেট্রলের সঙ্গে মিশে থাকা সীসা চারপাশের হাওয়াকে যে দূষিত করে তোলে তার ফলে ব্রিটেনের শিশুদের মধ্যে মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিচ্ছে। সীসার বিষাক্ত ক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে প্রধানতঃ শরীরের কেন্দ্রীয় স্নায়ু ব্যবস্থার উপর। তাঁর মতে এই বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশুদের বুদ্ধিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দিল্লী, কাম্পুচিয়া, সানফ্রানসিসকো ও ইংল্যাণ্ডের এইসব খবর থেকে

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বিশ্বের সর্বত্র বায়ুদূষণ হচ্ছে তীব্র হতে তীব্রতর। আমাদের পশ্চিমবঙ্গও বাদ যাচ্ছে না। সম্প্রতি খড়্গপুর আই. আই, টি.-র স্থাপত্যের অধ্যাপক বন্ধুবর ডঃ রোহিনীলাল মুনি চক্রবর্তী ও সহযোগী অধ্যাপক শ্রী বি. কে. সেনগুপ্ত কোলকাতার উপর এক যৌথ সমীক্ষা করেন। এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত ২৭ বছর ধরে কোলকাতায় দিনের উষ্ণতার সময়সীমা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে এবং তুলনামূলকভাবে দিনের শীতলতম সময় হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ুতে এই পরিবর্তনের ফলে অদূর-ভবিষ্যতে শীতকালেও কোলকাতায় ঠাণ্ডা থাকবে না। কোলকাতা শহরের দিনের ৯ ঘন্টা অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত উষ্ণতা পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের তুলনায় অল্প কম থাকে। কিন্তু বাকি ১৫ ঘন্টা শহরের উষ্ণতা গ্রামের থেকে বেশ বেশি। শীতকালে কোলকাতা শহরের উষ্ণতা গ্রামের থেকে প্রায় ৩° সেলসিয়াস বেশি থাকে। ব্রিটিশ চিকিৎসকদের মতে এই ধরনের উষ্ণ আবহাওয়া দৃষ্টিশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। বর্ধিত তাপমাত্রা চোখের মণিকে আংশিকভাবে পুড়িয়ে দেয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক অপেক্ষাকৃত কম বয়সে চশমা নিতে বাধ্য হয়। বলিভিয়ার আন্দিজ পাহাড়ের পার্বত্য মানুষ পঞ্চাশ বছরের আগে চশমা নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। অথচ ওইদেশের সমতলবাসীরা চশমা নেন চল্লিশে। কারণ পার্বত্য এলাকার তুলনায় সমতলের তাপমাত্রা ৫/৬° সে. বেশি। ব্রিটেনের মানুষ পড়াশুনোর জন্য চশমা নেন ৪৫-এ। ভারতীয়রা ওই জাতীয় চশমা নেন ৪০-এ। উষ্ণতর ফিলিপাইনে চশমা নেওয়ার বয়ঃসীমা ৩৬, সোমালিয়ার মরুবাসীদের ৩০।

কোলকাতার উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের বায়ুর গতিবেগ পরীক্ষা করে দেখা গেছে শীতকালে দমদম বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় ঝোড়ো দিনের সংখ্যা দক্ষিণের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশী। গ্রীষ্মে আলিপুর সংলগ্ন অঞ্চলে ঝোড়ো দিনের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ বেশি। শহরের প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ভাসমান ভূসোকালির পরিমাণ ২ টন। এগুলি প্রতিনিয়ত হাওয়ায় মিশে বায়ুদূষণ করছে। প্রতিদিন শহরে জমা হওয়া ২২০০ টন ময়লা থেকে বাতাসে উড়ে যাওয়া ধুলোর পরিমাণ বর্গ কিলোমিটারে পৌনে দু' টনের মত।

মজা হচ্ছে, শিল্প সমৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের স্থান

দশম অথচ দূষণের ক্ষেত্রে (যা নাকি মূলতঃ শিল্পবিপ্লবেরই দান !) আমরা এইসব বাঘা বাঘা শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিকে অনায়াসে পেছনে ফেলে রেখে এগিয়ে চলেছি। ভারতের শহরাঞ্চলের বায়ুদূষণের মাত্রা যে কোনো উন্নত পশ্চিমী দেশের তুলনায় ২ গুণ থেকে ৫ গুণ বেশি।

ভারতে আমেরিকার তুলনায় মোটরগাড়ীর সংখ্যা এক পঞ্চমাংশ হলেও দুই দেশের শহর এলাকার বায়ুদূষণ মাত্রা এক। ভারতে তৈরী মোটরগাড়ী অ্যামেরিকান গাড়ীর তুলনায় ৪ গুণ বেশি কার্বন মনোক্সাইড উৎপাদন করে। আমাদের একটা ধারণা আছে গাড়ির ডিজেল ইঞ্জিনগুলিই বেশি ক্ষতিকর। অধ্যাপক তারকমোহন দাস নিচের সারণী থেকে প্রমাণ করেছেন যে পরিবেশ দূষণে পেট্রল ইঞ্জিনই বেশি দায়ী :

৮নং সারণী

	ইঞ্জিন চলছে, গাড়ী অচল		গাড়ী চলন্ত	
কার্বন মনোক্সাইড (শতাংশে)	৭.০	সামান্য	১.৮	সামান্য
হাইড্রো কার্বন (শতাংশে)	০.৫	০.০৪	০.১	০.০১
নাইট্রোজেন অক্সাইড (পি. পি. এম.)	৩০	৬০	৬৫০	২৫০
	পেট্রল	ডিজেল	পেট্রল	ডিজেল

কোলকাতা ও হাওড়া শহরে প্রতিদিন যতটা দূষিত পদার্থ বাতাসে মিশছে তার একতৃতীয়াশ (দৈনিক ৩৬০ টন) আসছে মোটর, বাস, লরি, টেম্পো প্রভৃতি থেকে। এর প্রত্যক্ষ ফল অস্বাস্থ্যকর উষ্ণ আবহাওয়া ও খরা।

শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে আমাদের এ পার্থক্য কেন ? একটু ভাবলেই বোঝা যায় যদিও কলকারখানা ও গাড়ীর ইঞ্জিনেই দূষণের মূল উৎপত্তি কিন্তু এই বাড়াবাড়ির কারণ দূষণের প্রতি আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলা। ভারতে বায়ুদূষণ আইন প্রচলিত হয়েছে মাত্র ১৯৮১-তে। অথচ অন্য সব দেশে এ আইন চালু হয়েছে কমপক্ষে দশ বছর আগে। ভারতীয় বায়ুদূষণ আইনে বড় ধরনের ফাঁক রয়ে গেছে। এক, বায়ুদূষণের মান সম্পর্কে কোন

সংগঠিত কার্যধারা গ্রহণ করা হয় নি। দুই, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ ছাড় বা সুবিধা, যথা—ট্যাক্স রিবেট বা আর্থিক ঋণের ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিক-ভাবেই গাড়ীর মালিক বা শিল্পপতিরা এই আইন মানতে আগ্রহী হচ্ছেন না। আসলে পুরো ব্যাপারটাতে আমাদের সার্বিক পরিকল্পনাহীনতাই দোষী। যেমন ধরুন, আগামী শতাব্দীতে আমাদের জ্বালানীর জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে কয়লার উপরই নির্ভর করতে হবে। কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রক সেই ভাবেই তৈরী হচ্ছেন। ৮৪-৮৫ সালে কয়লা অনুসন্ধানের মাত্রা বাড়ানো হয়েছে যাতে সঞ্চয় গিয়ে পৌঁছায় ৩০০ কোটি টনে। এরজন্য ১৫০-এর জায়গায় প্রয়োজন ২০০ ড্রিল। ৭৫ কোটি টাকার এই অনুসন্ধান কার্যক্রমের নকশা প্রস্তুত করেছেন কেন্দ্রীয় খনি পরিকল্পনা সংস্থা। আগামীদিনের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখতে এই ব্যবস্থা। খুব ভাল কথা। কিন্তু এই সঙ্গে খনি পরিকল্পনা সংস্থা বা এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কেউই কি একবারও ভেবেছেন কয়লার উনুনে রান্না করলে, রাঁধিয়ে মহিলার ফুসফুসে যতটা বেঞ্জোপাইরিন যায় তা কুড়ি প্যাকেট অর্থাৎ ২০০ সিগারেটের সমান। এছাড়াও আছে ভাসমান ধোঁয়ার কণা। সব মিলিয়ে ওঁর ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা প্রবল! কয়লার ব্যবহার বাড়ানোর সাথে সাথে ধূমহীন চুল্লীর কথা কি কেউ ভেবেছেন? সারা দেশে এই চুল্লীর ব্যবহার আবশ্যিক করতে হলে কি পরিমাণ আর্থিক অনুদান প্রয়োজন তা কি কেউ হিসেব করেছেন? এইভাবে সার্বিক পরিকল্পনা (Total Planning) না করা হলে দূষণের সাথে লড়াই করা অর্থহীন।

এর ফল দাঁড়াচ্ছে অনেক ঢাকঢোল পেটান সত্ত্বেও কোলকাতা হয়ে উঠেছে ভারতের সবচেয়ে দূষিত শহর। সকাল সাড়ে দশটা ও বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় ৩২ পি. পি. এম. থেকে ৩৫ পি. পি. এম.-এ ; ভাসমান ধূলিকণা বেড়ে যায় প্রতি ঘন-মিটারে ৩৪০ থেকে ৫৩০ মাইক্রোগ্রাম। কোলকাতার বায়ুদূষণের সামগ্রিক চিত্রটা ৯ নং সারণীতে দেওয়া হল। পশ্চিমবাংলার মফঃস্বল শহরের অবস্থাও কিছু উন্নততর নয়[৬] :

৯নং সারণী

দূষণের উৎপত্তি স্থল	ভাসমান ধূলিকণা (দিন/টনে)	সালফার ডাই-অক্সাইড (দিন/টনে)	কার্বন মনো-অক্সাইড (দিন/টনে)	নাইট্রোজেন অক্সাইড (দিন/টনে)	হাইড্রো-কার্বন (দিন/টনে)
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	১৫০·০	৪৬·০	২·৩	১৭·২	১·১
কল-কারখানা	১০৭·৫	১১·৫	২·০	৭·৩	৩১·৩
ঘরবাড়ী গৃহস্থালী	২৫·৩	৫·৯	৩৩·৭	৭·২	৮·৪
যানবাহন	১·০	১·৩	১৩৮·৭	১৫·৬	১৮·৩
মোট	২৮৩·৮	৬৪·৭	১৭৬·৭	৪৭·৩	৫৯·১

আমাদের অতিপ্রিয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও শুরু হয়েছে দূষণজাত ক্ষয়। কমে যাচ্ছে মার্বেলের জেল্লা সীসে আর কার্বনের কালচে ছোপে, ক্ষয়ে যাচ্ছে ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি কার্বলিক অ্যাসিডের দহনে, সিমেন্ট বালির মসলা ক্ষয়ে আলগা হয়ে যাচ্ছে দেয়ালের পাথর, ছাদের ফাটল দিয়ে জল চুইয়ে পড়ছে, ভাসমান ধূলিকণার অত্যাচারে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে পেন্টিংগুলি। এ অবক্ষয় শুধু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নয়—কমবেশী সর্বত্রই হচ্ছে। শহরে ফাটছে বাড়ী : গ্রামে শুকোচ্ছে গাছপালা। গ্রামে যাবার আগে আলোচনা করে নেওয়া যাক আর এক নাগরিক উৎপাতের—**শব্দদূষণ**।

শব্দ শক্তি বা এনার্জির রূপান্তরিত চেহারা বিশেষ। যে-কোন শক্তির মতই (তাপ, আলো, গতিবেগ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাত্রায় শব্দ মানুষের দেহ ও মনের পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের পারিপার্শ্বিকে সবসময়ই কিছু-না-কিছু শব্দ হচ্ছে—পাখীর ডাক, ট্রেনের আওয়াজ, গাড়ীর হর্ন, প্লেনের শব্দ, ঘড়ির টিক টিক, রেডিয়ো, টিভি, মাইকের গান, ফেরিওয়ালার হাঁক—আকাশে বাতাসে নিরন্তর ভেসে বেড়াচ্ছে শব্দ-তরঙ্গ। যখনই তার পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ছে তখনই তা সৃষ্টি করছে এক দূষণের যার

ফল মানুষের স্নায়ু দুর্বলতা, পেশীর খিঁচুনী, বধিরতা, আন্ত্রিক ক্ষত, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, উচ্চ রক্তচাপ, স্মৃতিবিভ্রম, অনিদ্রা, গর্ভস্থ ভ্রূণের দৈহিক ও মানসিক বিকৃতি, এবং মৃত্যু। বছরখানেক আগে টোকিয়োতে ২২ বছর বয়স্ক এক অর্থনীতির ছাত্র শব্দের অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়ে পাঁচজনকে ছুরি মেরে খুন করে। নিহতদের মধ্যে দুটি শিশুও ছিল। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা জানিয়েছেন কোলকাতার পূজা মণ্ডপের মাইক-নিঃসৃত শব্দের পরিমাণ ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেলের মত। এই প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকলে ওই জাপানী ছেলেটির মত মস্তিষ্ক বিকৃতি যে-কোন সুস্থ মানুষেরই হতে পারে। শব্দের সহন মাত্রা দিনে ৫০ ও রাত্রে ৩৫ ডেসিবেল। প্রাবল্য ৭০ ডেসিবেলের বেশি হলে কানে অস্বস্তি লাগে। ৮০ থেকে ৯০-এর ভিতর শুনতে অসুবিধা হয় ও তার উপর শব্দ স্নায়ুতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে। ১৯৬৮-তে কলিকাতা নাগরিক সংঘ যে সমীক্ষা করেন তাতে দেখা যায় কোলকাতায় শব্দ দিন এবং রাত্রি দুই ক্ষেত্রেই সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে :

১০নং সারণী[৭]

কোলকাতার বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ-অঞ্চল	শব্দের গড় দূষণমান ৬৮-৭০ সালে ডেসিবেলে	৮১-৮২ সালে ডেসিবেলে	দিনের কতক্ষণ এই গড় মান বজায় থাকে
ভারী যানবাহন (ট্রাম, বাস, লরি)	৭২	৮১	১১ ঘন্টা
মাঝারী যানবাহন (ঐ)	৬৮	৭৮	১১ „
হাল্কা যানবাহন (গাড়ী, ট্যাক্সি, রিকশা)	৫৬	৭০	১৬ „
ছোট কারখানা	৭০	৭৯	১৫ „
ভারী কারখানা	৭৬	৮২	২৩ „
সিনেমা, বাজার কাটরা, স্কুল	৬৩	৭১	১৬ „

কোন কোন জায়গায় যেমন টালিগঞ্জ রেলপুলের নিচে শব্দমাত্রা ১১০ ডেসিবেল। অবস্থা ভয়াবহ।

১০নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি ক্ষেত্রেই দেড় দশকে শব্দের মাত্রা ৮ থেকে ১০ ডেসিবেল বেড়ে গেছে। কেন? এই প্রশ্নটার উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ১৪নং নকশায়। অর্থাৎ জনবিস্ফোরণের সাথে সাথে বাড়ছে কর্মচাঞ্চল্য এবং সেই সাথে শব্দ দূষণের মাত্রা।

জনবিস্ফোরণ ব্যাপারটার দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বিশ্বে ১৯৭৫ সালে ষাটোত্তীর্ণ দাদু-দিদিমার সংখ্যা ছিল ৩৫ কোটি, বর্তমানে ৫৯ কোটি। ২০২৫ খ্রীঃ ভারতেই তাঁদের দল ভারী হয়ে দাঁড়াবে ১৩০ কোটি। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শুধু নারী সংখ্যাই ১২০ কোটি থেকে বেড়ে ১৬০ কোটিতে দাঁড়াবে। আগামী একদশকে এই দেশগুলিতে ১৫ থেকে ৫০ বয়স সীমার অন্তর্ভুক্ত মহিলার সংখ্যা ৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু এঁরা সকলেই হবেন গর্ভধারণে সক্ষম, সন্তান বৃদ্ধির সম্ভাবনাও বাড়বে একই হারে। জনসংখ্যা বাড়ছে, কারণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মৃত্যু হার কমছে (দাদু দিদিমার দলভারী হওয়ার রহস্যও ওইখানেই)। আমাদের ঘরোয়া চিত্রটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে ৫নং সারণীতে প্রদত্ত ভারত, পশ্চিমবঙ্গ ও কোলকাতার তুলনামূলক জনঘনত্বের অগ্রগতির বিবরণে। এবং এই জনবিস্ফোরণের প্রায়শ্চিত্ত করছি আমরা নানা-ভাবে যার দু-চারটে সংবাদপত্রের পাতা থেকে তুলে নিয়ে উল্লেখিত হল এখানে :

ক. ই. ই. সি. ভুক্ত দেশগুলিতে মোট জনসংখ্যার ৯.৬% বেকার। শীর্ষে রয়েছে বেলজিয়াম তার ১৪.৬% বেকার নিয়ে।

খ. কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ ডঃ উইযেসিংঘে বলেছেন তৃতীয় বিশ্বে মানসিক বিকৃতির ঘটনা বাড়ছে। বর্তমানে মেলানকলিয়া ও সিজোফ্রেনিয়া রোগের হার ০.১% এবং ০.২%। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে এই হার বেড়ে দাড়াবে ০.৫% ও ১%।

(গ) বিহারে ৮০০০০ শিশু আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে ১৯৮০ সালে। অন্যান্য রোগে আক্রান্তের সংখ্যা—শ্বাসকষ্ট (৬০,০০০) ছোঁয়াচে রোগ (৩০,০০০), অপুষ্টি (২০,০০০), স্নায়ুরোগ (১২,০০০) হৃদরোগ (৩,০০০), জখম কিডনী (৬,০০০) ও বিষক্রিয়া (৩,০০০)। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি ৩টি শিশুর ভিতর একটির মৃত্যু হয়েছে।

(ঘ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব আঞ্চলিক কমিটির অধীন নটি দেশে কুষ্ঠরোগীর মোট সংখ্যা ৫৩,৪০,০০০। তার মধ্যে ৪০ লক্ষ ভারতে—যদিও ভারতে নথিভুক্ত কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ২৬ লক্ষ মাত্র।

(ঙ) মাদার টেরেসার হিসাবে কোলকাতায় আশ্রয়হীন ফুটপাথবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষ। শুধু শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও বাড়ছে জনসংখ্যা। অপ্রতুল হচ্ছে সেখানের কৃষি ও বাস্তু জমি। চাহিদা মেটাতে বাড়ছে জমির দাম, বসছে বন কেটে বসতি, কৃষি খামার, কলকারখানা। ভারসাম্য হারাচ্ছে আ-সমুদ্র হিমাচল ভারতের পরিবেশ—যার ফল জীবলুপ্তি, অর্থনৈতিক সর্বনাশ।

'বন কেটে বসতি' কথাটার মধ্যে যতই কাব্যিক ঝঙ্কার থাকুক না, বাস্তবের গদ্যময় রূঢ়তা আছে অনেক বেশী। পশ্চিমবঙ্গ বন বিভাগ উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করেছেন যে সংরক্ষিত জঙ্গলে সশস্ত্র মানুষ ট্রাকে করে আসছেন, সঙ্গে আনছেন যান্ত্রিক করাত, নির্মূল করে কেটে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাক ভর্তি গাছ। এই সব লোক মোটেই বনপ্রান্তের গ্রাম থেকে আসা কাঠুরে নয়। এরা সংঘবদ্ধ ধনী কাঠের চোরাকারবারী। বন আইনে জঙ্গলের ২ কিলোমিটারের মধ্যে চেরাই-কল (Saw Mill) বসানো নিষিদ্ধ। তাই গত পাঁচ বছরে পশ্চিম বাংলায় যে ৫০০ মিল বসেছে তার অধিকাংশই নদীতীরে অবস্থিত যাতে বনাঞ্চল থেকে নদীপথে সহজেই পাচার করা যায় চোরাই কাঠ। বনমন্ত্রীর হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে মোট জমির মাত্র ১৩½ শতাংশ বন (ভারতীয় গড় ২২ শতাংশ, বিজ্ঞানীদের মতে হওয়া উচিত ৩৩ শতাংশ)। পশ্চিমবঙ্গে বন বিস্তারের সুযোগ নেই ; অভাব উপযুক্ত জমির। শাল কাঠের দাম প্রতি ঘনমিটারে ৬০০০ টাকা, সেগুন ৮০০০ টাকা। এই মহার্ঘতাই বননাশের প্রধান কারণ। এ ব্যাপারে স্থপতি ও আসবাব নির্মাতারা বাড়ীঘরে ও আসবাবে কাঠের বিম, বরগা, মেঝে, চৌকাঠ, দরজা-জানালার পাল্লা ও আসবাবে পরিবর্ত মাল হিসাবে কংক্রিট, ইস্পাত, ফাইবার গ্লাস, কাঁচ, প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির ব্যবহার যদি চালু করে কাঠের চাহিদা ও দাম কমাতে পারেন তবেই একটা সুরাহা হবে। চোরাচালানী জানে এক ট্রাক কাঠের দাম ৫০,০০০ টাকা। যাতায়াত, খাই-খরচ মায় বনপ্রহরীদের মোটা ঘুষ দিয়েও তার পকেটে থেকে যায় কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা। এর পরেও সে বন সংরক্ষণে উৎসাহী হবে এত পরিবেশ-প্রেমিক

সে নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা এভাবে বনলুপ্তি হলে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অন্ততঃ ২৫,০০০ শ্রেণীর জীব-জন্তু-পাখী লুপ্ত হয়ে যাবে ধরার পৃষ্ঠ থেকে।

এই তো সেদিন, নারকেল আর খেজুর গাছের ঝোপে।
এই তো সেদিন, তবু যেন অনেক অনেক দূর,
অনেক শিশির ঝরে গেছে
তাতিয়ে গেছে কত না রোদ্দুর।
অনেক ধূলোয় মলিন পা তার
অনেক ধোঁয়ায় ঝাপসা দুটি চোখ।
আমার শহর ভুলে গেছে
তার জীবনের আদি পরম শ্লোক।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

ভূ-সংরক্ষণে কিন্তু আবার রচিত হতে পারে সেই হারিয়ে যাওয়া পরম শ্লোক।

---

১. ডঃ ভি. পি. কুড়েসিয়া ২. ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩. ডঃ নিশীথরঞ্জন কর ৪. অনুপম হালদার ৫. ডঃ জে. এল. কাও, আই. টি. আর. সি. ৬. ও ৭. সলিল লাহিড়ী।

আজ থেকে আড়াই শো বছর আগের কথা। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ। রাজস্থানের ছোটবড় নানা স্বাধীন, প্রায়-স্বাধীন, আধা-স্বাধীন রাজন্য সমাজের প্রধানতম শিরোমণি ছিলেন যোধ-পুরের মহারাজা। তিনি ঠিক করলেন বানাবেন এক মান মনোহর রাজপ্রাসাদ। স্থপতির নকশায় পরিকল্পিত হল এক দারুময় মহাশিল্পের। রাজকীয় কাঠুরিয়া বাহিনী চল্লেন শহরের প্রান্তে পাহাড় ঘেরা জঙ্গলে কাঠের যোগাড় করতে। জঙ্গলের একপাশে আদিবাসী গ্রামে থাকেন বিষ্‌নো সম্প্রদায়। গুরু তাদের শিখিয়েছিলেন 'বৃক্ষ' পূজা করতে। গাছ ছিল তাঁদের কাছে প্রণম্য, অচ্ছেদ্য।

৬ ভূ-সংরক্ষণ প্রস্তাব
PROPOSAL ON SOILCONSERVATION

এগিয়ে এলেন গ্রামের প্রবীণতমা মা অমৃতা বাঈ। বারণ করলেন গাছ কাটতে। সে কথা শুনল না কাঠুরিয়ারা। তখন তিনি বনের পয়লা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, 'বেশ তবে কাটো আমাকে।' কুড়ুলের আঘাতে লুটিয়ে পড়ল তাঁর দেহ। কণ্ঠে বাজল অন্তিম স্লোগান 'চিপকো'। জড়িয়ে ধর। অমৃতা বাঈয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণ দিলেন তাঁর ৩ মেয়ে, ৩৫৬ জন গ্রামবাসী। এইভাবে শুরু হল বিশ্বখ্যাত গাছ বাঁচাবার চিপকো আন্দোলন যার কাছে সেদিন হার মেনেছিলেন যোধপুর মহারাজ।

দৃষ্টিপাতে যাযাবর লিখেছিলেন, 'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।' ইমোশানের বদলে মোশান। যা যাযাবরের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছল বা তখনও ধরতে পারেন নি বিজ্ঞানীরা, আজ যা দিনের আলোর মত স্পষ্ট তা হচ্ছে বিজ্ঞান 'বেগের' সাথে আমাদের উপহার দিয়েছে 'উদ্বেগ' : 'মোশানের' সঙ্গে 'কমোশান'। আর এই উদ্বেগের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ভয়াবহ পরিবেশ দূষণ। তাই পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে চিন্তা-ভাবনা—পরিবেশ সংরক্ষণের নানান জল্পনা-কল্পনা। এরই কিছু কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে।

আমাদের কৃষিপ্রধান পরিবেশ। কাজেই আলোচনা শুরু করা যাক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতি ও **ভূমি সংরক্ষণ** (Soil Conservation) নিয়ে। ভূমি সংরক্ষণ হচ্ছে কৃষি ও বনসৃজনে এমন কিছু প্রযুক্তিগত কৌশল কাজে লাগানো যাতে জমির উর্বরতা, আদি চরিত্র, জলধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি বছরের পর বছর অটুট থাকে। যেমন ধরুন, একটা জমিতে যদি কয়েক বছর বাদে বাদে শস্য বদলানো (Crop Rotation) হয় তাতে ফলনও বাড়ে, জমির লবণাক্ত-ভাব, পি. এইচ. মান ইত্যাদি প্রয়োজন মাফিক বজায় থাকে। এইভাবে যদি একটি জমিকে কয়েক বছর বাদে বাদে শস্যক্ষেত্র, চারণভূমি ও বন অঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা হলে জমির উর্বরতার মাত্রা বজায় থাকে সঠিক পরিমাণে। একে বলে 'ঝুম' পদ্ধতি (Shifting Cultivation)[১]। পাহাড়ী অঞ্চলে ঢালু পাহাড়ের গায়ে চাষের সময় ঢালের সমান্তরালে সিঁড়ির মত ধাপ কেটে শস্যক্ষেত্র বানানোর নাম কনট্যুর ফার্মিং (৯নং চিত্র)। এও ভূমি সংরক্ষণের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। লাগাতার চাষে বছরে প্রতি একরে প্রায় ১০ টন মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শস্য বদল পদ্ধতিতে রবিশস্যের সাথে পশুখাদ্যের ঘাস ইত্যাদি বদল করে চাষ করে এই মাটির ক্ষয় বার্ষিক সাত টনে নামিয়ে আনা যায়। ঝুম পদ্ধতিতে তা আরো কমিয়ে ৩ টনে দাঁড় করানো যায়। বনাঞ্চলের একটি বড় গাছ যা অক্সিজেন উৎপাদন বা অঙ্গার শোষণে ৩০০০ চারা গাছের সমান তা ছাতার মত মাটিকে রক্ষা করে বৃষ্টির তোড় থেকে। ১ সেন্টিমিটার মাটির আবরণ তৈরী হতে

লাগে এক শতাব্দীর মত। লাগাতার বৃষ্টির তোড়ে এই মাটি ধুয়ে যেতে পারে ৩/৪ দিনে যদি তার উপর উদ্ভিদের আচ্ছাদন না থাকে। আবার এই ধুয়ে যাওয়া মাটি নদীখাতকে ভরাট করে সৃষ্টি করে পাড়-ভাঙ্গা বন্যার। বনভুমি পচা পাতার সার মিশিয়ে মাটির জলধারণ ক্ষমতা ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে। বনজঙ্গল যে আবহাওয়াকে সরস রাখে, এতো আজ সবার জানা। এছাড়া প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া যায় এমন গাছের চাষ করলে (যাকে এখন বলা হচ্ছে সমাজভিত্তিক বনসৃজন), যে কয় বছর জমিতে চাষ হবে না, বনচাষীকে পরিবর্ত আয়ের পথ খুলে দিতে পারবে। আমাদের দেশে বন নাশের প্রধান দুটি কারণ হল ঘর-বাড়ী-আসবাবে কাঠের চাহিদা ও জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার। ন্যাশনাল সার্ভে অনুযায়ী দেশে মাথাপিছু জ্বালানীর দৈনিক খরচ :

১১ নং সারণী

কাঠ	—০·৪২৮ কেজি	বিদ্যুৎ	—০·০০৬ কেজি
ঘুঁটে	—০·০৯৩ ,,	কাঠ কয়লা	—০·০৩৫ ,,
কয়লা	—০·০৩০ ,,	গ্যাস	—০·০০১ ,,
কেরসিন	—০·০২৮ ,,	অন্যান্য	—০·০১৬ ,,

জ্বালানী হিসাবে কাঠের আকর্ষণ তার স্বল্প মূল্য, সহজলভ্যতা এবং উচ্চতাপমান। ১ কেজি কাঠে ৩,১০০ ক্যালরি তাপ পাওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামদেশে জ্বালানী কাঠ সরবরাহের উদ্দেশ্যে **সমাজভিত্তিক বনস্থজনের (Social Forestry) প্রকল্প** হাতে নিয়েছেন যাতে ২৬,০০০ হেক্টর নতুন বন ও ১৫,০০০ হেক্টর অবক্ষয়িত বনের পুনঃ সৃজন হবে সরকারী জমিতে ও ৫২,০০০ হেক্টর বন সৃষ্টি হবে ব্যক্তিগত মালিকানায়।

কীট বা আগাছা-নাশক হিসাবে উপকারী কীট (অ্যাজোব্যাক্টার) পালন ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক সফল প্রযুক্তি। চাষের জমিতে ঝুম পদ্ধতিতে ভেষজ (যষ্টিমধু, ঘোড়ানিম, কর্পূর, তুলসী, সুষনি শাক, নয়নতারা, কালমেঘ, সূর্যমুখী, ভেরেণ্ডা, ফণিমনসা ইত্যাদি)-এর চাষও সুফল দিতে পারে। কচুরী পানা জল থেকে অক্সিজেন টেনে নিয়ে মাছ চাষ ধ্বংস করছে। অ্যামেরিকা থেকে কিছু পোকা-মাকড় আমদানী করা হয়েছে যা কচুরীপানা খেয়ে নির্মূল

করবে। আমরা জানি মৌমাছি একটি পরাগ-সংযোগকারী পতঙ্গ। মৌ-বাক্সে (কৃত্রিম উপায়ে) মৌমাছি পালন করলে ও সেই মৌ বাক্সগুলি চাষের ক্ষেতে বসিয়ে রাখলে মধু থেকে বাড়তি আয় তো হবেই, সেই সাথে অধিকতর পরাগ সংযোগের ফলে খুব কম সার প্রয়োগে অধিক উৎপাদন হবে। দক্ষিণ বাংলায় এইভাবে লিচু, সূর্যমুখী শসা, সরষে, সজনে ইত্যাদির চাষে ১৫ থেকে ৫০০ ভাগ অবধি ফলন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীতে নিমপাতা ও নিমফল গুঁড়িয়ে জলে গুলে একধরনের খুব সস্তা কীটনাশক তৈরী করেছেন গিসেন বিশ্ববিদ্যালয়। এতে ডি. ডি. টি. জাতীয় কীটনাশকের মত বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া নেই। এ প্রযুক্তি আমরাও সহজেই গ্রহণ করতে পারি। এছাড়া নতুন নতুন প্রজাতির শস্য উৎপাদনও সম্ভব যাতে কীটনাশক ও সারের প্রয়োজন হবে ন্যূনতম। চুঁচুড়া ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের নতুন প্রজাতির ধান সি. এন. ৫৪০ শাকী পোকার আক্রমণ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই বেশ ভাল ফলন দিচ্ছে। এছাড়া সারা রাজ্যের জন্য ভূমি পরীক্ষা করে এবং শস্য-সার প্রতিক্রিয়া সমীকরণ করে একটি সার প্রয়োগ ফরমূলার চার্ট কৃষি বিভাগ তৈরী করতে পারেন যাতে ন্যূনতম সার প্রয়োগে চাষী সর্বাধিক ফসল পাবেন অথচ জমিও অজৈব লবণে ভারাক্রান্ত হবে না। যেমন বলা চলে ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, কুচবিহার ও জলপাইগুড়িতে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ফসফেট ঘটিত সারের ঘাটতি রয়েছে। খড়্গপুরের অধ্যাপক সিদ্ধার্থ রায় এ ব্যাপারে গবেষণা করে বার করেছেন আমাদের ১৫টি জেলায় মূল ৬ শ্রেণীর মাটিতে তিন রকম রাসায়নিক সারের কতটা প্রয়োগ করে প্রধান ১৪টি শস্যের কোন্‌টির কি রকম ফলন হবে।

ফসলের গোড়ার অর্ধেকই বিদেশ থেকে আসে (২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আইসল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা আলুবীজের চাষ হয় দার্জিলিং-এ। এই সঙ্গে আসা ধ্বসারোগ ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে)। রোগপোকার আগমন রোধ করতে শুল্কবিভাগের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করছেন কৃষি-মন্ত্রকের উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ। এও প্রকারান্তরে ভূমি সংরক্ষণেরই প্রচেষ্টা।

ভূমিক্ষয়ের আর এক ভিন্নরূপ পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার খরাপীড়িত মাটি। এই মাটিকে, এই পরিবেশকে স্নিগ্ধ করে তুলতে পারে সোনাঝুরির জঙ্গল। এই

গাছ আমাদের চিরায়ত শাল-পিয়াল-মহুল-শিমুলের থেকে খরা অঞ্চলের পক্ষে অনেক বেশি উপযোগী। এ ছাড়া এখানে চাষ করা দরকার **নিবিড় শুষ্ক-চাষ**[২] (Integrated Dry Farming) পদ্ধতিতে। এইভাবে সর্বাত্মক চেষ্টায় ভূমিক্ষয় রোধ সম্ভব পশ্চিমবাংলায়। শুষ্কচাষ ব্যাপারটা আসলে সুষ্ঠু জলবন্টন ব্যবস্থার মারফত ন্যূনতম জলসেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন। কৃষি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন উদ্ভিদের জলসেচের প্রয়োজন এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম এবং মাত্রায় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। যেমন ধরুন, ধান চাষে চারাকে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। এটি দরকার কেবলমাত্র অঙ্কুরোদ্গমের ও বীজতলায় বেড়ে ওঠার সময়। ঠিক ৫ সেণ্টিমিটার জলের তলায় ডুবে থাকা প্রয়োজন। এইভাবে বেঁটে গমগাছেরও প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট সেচ—পরিমিত মাত্রায় ও সঠিক সময়ে। নির্বাচিত বীজ দিয়ে পরিমিত সেচপ্রয়োগে চাষ করলে জলের ব্যবহার অনেক কমানো যায়। এছাড়া প্রচলিত পদ্ধতিতে খাল বা নালার মাধ্যমে যে সেচ হয় তাতে প্রায় অর্ধেক জল খালের মাটি শুষে নেয় বা রোদে বাষ্প হয়ে শুকিয়ে যায়। অ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিক নল দিয়ে ফোয়ারা (Sprinkler) বা ফোঁটা-ফেলা যন্ত্র (Drip)-এর মাধ্যমে সেচ দিলে এ অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে। এতে বেঁচে যাওয়া জলের দাম থেকে অল্প দিনেই নল ও যন্ত্রপাতির দাম উঠে আসবে। তা ছাড়া এভাবে খরা-অঞ্চলে চাষের ব্যাপকতাকে অনেক প্রসারিত করা যায়। এইসব পদ্ধতি অবলম্বনে যে চাষ তাকেই বলে নিবিড় শুষ্ক চাষ (Integrated Dry Farming)।

খরা অঞ্চলে ভূমিক্ষয় রোধের আর এক অস্ত্র, আগের পাতায় বলেছি—বনসৃজন। একশ বছর আগে এসব অঞ্চলে যখন শালবন ছিল তখন তার মাটিও ছিল সরস, নরম, আর্দ্র। সেই অবস্থায় শালের বীজ পুঁতলেই গাছ হতে পারত, যেমন আজও হয় উত্তরবঙ্গে। পুরুলিয়া প্লেটুতে শালবন রচনা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। প্রত্যেকটি গাছের জন্য আলাদা গর্ত করে, ভাল মাটি ও সার দিয়ে সে গর্ত ভরে, শাল চারা পুঁতে, জল সেচ ও ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একরপিছু হাজার শাল চারাকে এই-রকম যত্ন করে বন রচনা অসম্ভব। এর কুড়িভাগের একভাগ খরচে সোনা-ঝুরির জঙ্গল সৃষ্টি করা যেতে পারে যাতে বনের সংশ্লিষ্ট সরসতা আপনিই আসবে। প্রশ্ন উঠতে পারে সোনাঝুরি কি শালকাঠের মত অর্থকরী (Cash-

Crop) হবে ? সোনাঝুরির কল্যাণে গড়ে উঠতে পারে কাগজ কল, কাঠ-গুড়োর তাপ নিরোধক বোর্ড শিল্প। এইভাবে পরিসংস্থান (Infra-structure) গড়ে তুলতে সোনাঝুরির বনও শালের মতই চাহিদা সৃষ্টি করতে পারবে আর সেইসঙ্গে পারবে দেশ থেকে খরাকে নির্বাসন দিতে। এইভাবে কেবল সমাজভিত্তিক বনই নয়, বন-ভিত্তিক সমাজও গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সি. এম. ডি. এ. এক বিজ্ঞপ্তিতে একটি ৫০ বছরের মাঝারী আকার ৫০ টন ওজনবিশিষ্ট গড়পড়তা গাছের মূল্যায়ন করেছেন নিম্নরূপ :

১২ নং সারণী[৩]

১. তৈরী অক্সিজেনের দাম	২,৫০,০০০ টাকা
২. রূপান্তরিত জৈব প্রোটিন	২০,০০০ "
৩. ভূমিক্ষয় ও উর্বরতা নিয়ন্ত্রণ	২,৫০,০০০ "
৪. জলের পুনর্ব্যবহার/আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	৩,০০,০০০ "
৫. বন্যপ্রাণী, পাখী ও লতাজাতীয় উদ্ভিদকে আশ্রয় ও আহার্য দান	২,৫০,০০০ "
৬. পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ	৫,০০,০০০ "
মোট	১৫,৭০,০০০ টাকা

বিজ্ঞাপন-সুলভ চমক থাকলেও হিসাবটা মিথ্যে নয়। ভূমিক্ষয়ই ধরুন। আজ এটা পরীক্ষিত সত্য যে যেখানে মাটির উপর উদ্ভিদের ঘন সমাবেশ, সেখানে ভূমিক্ষয় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ সবুজের আচ্ছাদন থাকলে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটির কণা সহজে স্থানচ্যুত হয় না। এমনকি জমি যদি ঘাসে ঢাকা তৃণভূমি হয় তা হলেও। বড় মাপের উদ্ভিদ হলে আরো ভাল। প্রথমতঃ বৃষ্টি সরাসরি মাটিতে আছড়ে পড়ে মাটির কণাগুলিকে চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারে না। গাছের পাতায় তার প্রাথমিক গতি রুদ্ধ হয়, গাছের গা থেকে বাড়তি জল ঝরে পড়ে মন্থরবেগে। জলের গতি বাড়লেই সর্বনাশ। এই গতি দ্বিগুণ হলে, জলের মাটি সরাবার ক্ষমতা হয়ে দাঁড়ায় ৬৪ গুণ! তাছাড়া ঘন সন্নিবেশিত উদ্ভিদের নিচে মাটি থাকে আর্দ্র, নরম

যা স্পঞ্জের মত বৃষ্টির জলের একটা বড় অংশ শুষে নেয়। ব্রহ্মডাঙ্গার নেড়া জমিতে যেহেতু জলের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করার মত কোন গাছগাছালি থাকে না, জল চট করে গড়িয়ে নালা-নর্দমা পথে বয়ে যায়, খরাপীড়িত কঠিন মাটি ভেজবার সময় পায় না। এবার ভাবুন ১২ নং সারণীর ৩ ও ৪ নং কাজের মূল্যমান যথাক্রমে আড়াই ও তিন লাখ টাকা কি খুব একটা বেহিসেবী ?

অথচ কি ভাবে আমাদের এই মহামূল্য বৃক্ষরাজি নষ্ট করা হচ্ছে তা ভাবলে চমকে উঠতে হয়। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে-প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী অনুমতি নিয়ে কাটা কাঠের পরিমাণ যেখানে ৯০ লক্ষ টন, বে-আইনী ভাবে কাটা কাঠের পরিমাণ সেখানে ১ কোটি টনেরও বেশী। ভারতে জ্বালানী কাঠের খরচাই বছরে ১ কোটি ২২ লাখ টন। এ ছাড়া আছে আধপোড়া কাঠ থেকে কাঠ কয়লা বানিয়ে কেজি দরে বেচার ব্যবসা। কিছুদিন আগেও পলাশ-শিমুল কাঠ পুড়িয়ে ছাই থেকে বের করা হত কাপড় কাচার গ্রামীণ ক্ষার। আসবাব ও ঘরবাড়ীর সরঞ্জামের চাহিদা তো আছেই।

রাজ্যবিধান সভার এস্টিমেট কমিটি তাদের ২৩শ তম প্রতিবেদনে বলেছেন বনভূমির এলাকা এ রাজ্যে ১৩·৪৩ শতাংশ। হওয়া দরকার ২৫·৩৪ শতাংশ। নদীর অববাহিকা অঞ্চলে যাতে মোট এলাকার ৬০ শতাংশ বনভূমি থাকে, কমিটি তা সুপারিশ করেছেন। কমিটির মতে লালমাটি (Laterite) অধ্যুষিত খনি অঞ্চলে মাটি ও আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব যদি এই সব এলাকায় বনভূমি সৃষ্টি করা হয়। ৪র্থ পরিকল্পনায় প্রতি হেক্টর বনভূমিতে প্রতি বছর বিনিয়োগ করা হয়েছিল মাত্র ২ টাকা ৪০ পয়সা। এই বিনিয়োগের পরিমাণ জাপানে হল ১৯০ টাকা, কোরিয়ায় ১১৮·৮০ টাকা। বনসম্পদের এই জাতীয় উপেক্ষা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আরো দরকার অবিলম্বে কাঠ কাটার কাজে প্রাইভেট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ বন্ধ করে কাঠ কাটা ও বিক্রির দায়িত্ব বন উন্নয়ন কর্পোরেশনের হাতে তুলে দেওয়া। সরকারের সমাজভিত্তিক বন সৃজন প্রকল্পে ৯৩,০০০ হেক্টর আবাদী বন গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে বাড়বে শালখুটি, বাঁশ, পশুখাদ্য, ফল, তৈলবীজের সরবরাহ। এর মধ্যে রয়েছে সড়ক, খাল ও রেলপথের পাশে ২০,০০০ হেক্টর স্ট্রীপ প্লান্টেশন ও ৬,০০০ হেক্টর গ্রামীণ জঙ্গল। এ ছাড়া ২৫০০ নির্বাচিত

পঞ্চায়েতে এক হেক্টর করে নমুনা বন সৃজন করা হবে আগামী ছয় বছরে। এই সব নমুনা বন ছাড়াও আমার ধারণা পঞ্চায়েতের অধীনে বহু পতিত জমি পড়ে রয়েছে। এই সব সরকারী জমিতে ভাগ চাষের শর্তে (যেমন ধরুন মোট লাভের ৩৩ শতাংশ পাবেন পঞ্চায়েত, ৬৬ শতাংশ ভাগচাষী) ব্যক্তিগত উদ্যোগে বনসৃজন করবার ব্যবস্থা করলে অল্প দিনেই বাংলার পল্লী অঞ্চল সবুজ হয়ে উঠবে। গ্রামের মানুষ বাড়তি আয়ের জন্য এ ধরনের ভাগচাষে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠবে। পঞ্চায়েতেরও একটা নতুন আয়ের পথ খুলে যাবে। সম্প্রতি বাংলাদেশে খাল বিলের দুপাশে এই পদ্ধতিতে লাগানো হয়েছে নারকেল চারা ৬ মিটার অন্তর। এই যৌথ (সরকারী ও বেসরকারী) স্ট্রীপ প্লান্টেশন সে দেশের চেহারা বদলে দেবে আগামী ৮।১০ বছরের মধ্যে। এই হল সত্যিকার গণ-অরণ্য (Social Forest)। আমাদের অপর প্রতিবেশী বিহারও এগিয়ে চলেছে এ ব্যাপারে। বিহারে বনাঞ্চলের বর্তমান অনুপাত ১৬·৮৫% (মাথাপিছু ০·০৫ হেক্টর) যার আয়তন ২৯,২৩২ বর্গ কিলোমিটার। বিহারে বনরোপণের কাজ শুরু হয় ১৯৫২ সালে হাজারীবাগে—লক্ষ্য ছিল আরো ১২০০০ বর্গ কিলোমিটার বনসৃজন। বনসৃজনে সরকারী ব্যয় কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তার থেকেই বোঝা যায় বনসৃজনে বিহারের অগ্রগতি :

৭৬-৭৭ সালে—১৪ লাখ টাকা
৭৭-৭৮ ,, —৩৫ ,, ,,
৭৮-৭৯ ,, —৪৫ ,, ,,
৭৯-৮০ ,, —৫০ ,, ,,

বন প্রসারণ নিয়ে আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রেখে চলুন আমরা যাই ভূমি সংরক্ষণের অপরাংশ বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতিতে, যার খুবই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছি আমরা এই অধ্যায়ের গোড়াতে। পৃথিবীতে কৃষিবিদ্যার চলন ও সেই সাথে জলসেচন ও বনজঙ্গল সাফাই শুরু হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ সাল নাগাদ। এর পর ৮০০০ বছর ধরে একদিকে বাড়তে লাগল জনসংখ্যা। আর ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার চাহিদায় অন্যদিকে বাড়তে লাগল ফসল উৎপাদন। অবিবেচকের মত বনভূমি নাশ করে বাড়ানো হল কৃষিক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি, জনবসতি। মোট পার্থিব লোক-সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৩০০ কোটিতে। এই বিপুল মানবগোষ্ঠীর মুখে খাদ্য

তুলে দিতে ১৯৫০ সালে বিজ্ঞান মানুষকে উপহার দিল উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার, গভীর নলকূপের জলে অঢেল সেচ ব্যবস্থা—এক কথায় সবুজ বিপ্লব। ইতিমধ্যে বিশ্বের অরণ্যভূমি ৭০% থেকে কমে ২৫%-এ দাঁড়িয়েছে। ক্রমবর্ধমান প্রাণিজগতের দেহ-নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিপুল সঞ্চয় (এর মধ্যে অবশ্য ক্রম-প্রসারিত শিল্পের অবদানও কম নয়) ক্রম-ক্ষীয়মাণ বনসম্পদ আর পরিশোধন করে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করতে পারছে না প্রাকৃতিক উপায়ে। ফল ঃ বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে ঘন থেকে ঘনতর কার্বন ডাই-অক্সাইডের আবরণ। ভূপৃষ্ঠের তাপ বেড়ে চলেছে বছরে ০·৫° সেন্টিগ্রেড হিসাবে। এই তাপের সাঁড়াশী আক্রমণ হবে দুভাবে—এক, খরা কবলিত পৃথিবীতে বাড়বে মরু অঞ্চল, খাদ্য ঘাটতি, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু ; দুই, বাড়তি উত্তাপ গলিয়ে দেবে মেরুর সঞ্চিত বরফ, বিধ্বংসী বন্যা, সংপ্লাবন, ভূমিনাশ ও শেষে একই ফল—প্রাণিগোষ্ঠীর মৃত্যু !

এবার দেখা যাক প্রাগুক্ত সবুজ বিপ্লবের ভূমিকাটি কি ? আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হচ্ছে অতি ফলনশীল উন্নত বীজ, যার চাষে প্রয়োজন অজৈব সালফেট ও ফসফেট জাতীয় নাইট্রোজেন ঘটিত সার, ডি. ডি. টি. জাতীয় কীটনাশক, প্রচুর সেচ (যার চাহিদা প্রাকৃতিক উপায়ে মেটানো অসম্ভব ; বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করে এবং বড় গভীর নলকূপের সাহায্যেই একমাত্র এ চাহিদা মেটানো যায়)। এই সার ও কীটনাশক ফলনে আপাত-চমকের সৃষ্টি করলেও দীর্ঘমেয়াদী কুফল হিসাবে জমিকে ধীরে ধীরে লবণাক্ত অনুর্বর করে তুলছে। অতি সেচেও জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে নানান দুষ্ট লবণ। বিশেষতঃ গভীর নলকূপের জল তুলে আনছে খনিজ লবণ যা মাটির উর্বরতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে অতি দ্রুত। এই ভাবে ফসল ফলানোর প্রতিযোগিতা চললে অচিরেই আমাদের কৃষি জমিগুলি রূপান্তরিত হবে লবণাক্ত মরুভূমিতে। বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টিও ক্ষতি করছে আর এক ভাবে। আগেই বলেছি জলাধারে পলি জমা হচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে। ডি. ভি. সির মাইথন বাঁধে, বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন বছরে পলি জমা হবে ৩৪ একর ফুটের মত। এখন দেখা যাচ্ছে পলি জমার প্রকৃত হার বার্ষিক ৩০০ একর ফুট। দেশের সব কটি বাঁধেই একই চিত্র[৪]। এই জমা পলি নদী, নালা, ক্যানাল ও জলাধারের নাব্যতাকে কমিয়ে দিয়ে, বাড়িয়ে দিচ্ছে তার পরিধি। নিত্যনতুন জমি পড়ছে তার

করলে। বাড়ছে বন্যার প্রকোপ, ভূমিক্ষয়। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কোন সন্দেহ নেই উচ্চ ফলনশীল শস্য অচিরেই টেনে আনবে শস্য ঘাটতি (এক ভারতেই ১৪০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিস্তৃত হয়েছে এই ভূমিক্ষয়—যা ভারতীয় কৃষি জমির অর্ধেকের সমান।

এই বীভৎস অবক্ষয় রোধ করতেই হবে। এজন্য প্রয়োজন এক সুপরিকল্পিত অভিযান ঃ সমস্যাগুলির সম্যক মূল্যায়ন করে তাদের বিরুদ্ধে বহুমুখী আক্রমণ, এক সর্বাত্মক যুদ্ধ। আমাদের পরিকল্পিত এই অভিযানের পাঁচটি অংশ ঃ

ক. বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন

খ. নিবিড় জল ব্যবস্থা ও ন্যূনতম সেচ

গ. সুসম সার বন্টন ও প্রাকৃতিক উপায়ে ফলন বৃদ্ধি

ঘ. কীট ও আগাছা-নাশক নিয়ন্ত্রণ

ঙ. কৃষিজমি সংরক্ষণ (আইনগত)।

ক. **আধুনিক কৃষি পদ্ধতির** মধ্যে যেমন একদিকে রয়েছে **ঝুম** (Shifting Cultivation) বা **শস্য বদলানো** (Crop Rotation) পদ্ধতিতে চাষ, রোগ প্রতিরোধী মধ্য ফলনশীল বীজের ব্যবহার (যথা সি. এন. ৫৪০ ধান বীজ, ডি. ডাব্‌লু. এল. ৫০৩২ গম বীজ ইত্যাদি নব-উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজাতি), ইত্যাদি সনাতন ফল প্রদায়ী পদ্ধতি ; অপর দিকে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। যেমন ধরুন, বনভূমিতে চাষ। বন ও কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদবিদ্যার শাস্ত্রীয় সাদৃশ্য যতই থাকুক, সম্পর্ক মোটেই সদ্ভাবের নয়। কৃষকের চোখে বন অনিষ্টকারী পশু-পাখী, পোকা-মাকড়ের আড্ডা যার জঙ্গলে ডালপালা রুখে দেয় তার ফসলের প্রাণ-ভোমরা সূর্যের আলোকে। কিন্তু বনভূমিই জলের বেগ ধারণ করে, মাটিতে সবুজ সার ছড়িয়ে, হাওয়া থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে, মাটিকে লবণ ও ক্ষারমুক্ত করে নানাভাবে ভূমি সংরক্ষণ করছে যা চাষের ফসলের ক্ষমতার বাইরে। কাজেই বাধ্য হয়ে আমাদের ৩৩ শতাংশ জমি আটকে রাখতে হচ্ছে বনভূমি হিসাবে যদিও কৃষি জমির আমাদের প্রচণ্ড ঘাটতি। এই দুই সমস্যার পাখীকে এক ঢিলে মারবার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা বন বা ফল বাগিচাকে অক্ষুণ্ণ রেখে সেখানে একই সাথে কৃষিকার্য ও পশুচারণ চালিয়ে (Agro-Sylvo-Pastoral System)। এই বামুনের গরু

সৃজনের মূলমন্ত্র—জমি ও পরিবেশের উর্বরতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি একই সঙ্গে বনজ ও কৃষিজ উৎপাদনের সম্ভবপর ও সুষম পরিমাণ বৃদ্ধি (Conservation of Eco-system and Balanced Optimum Production of Forest and Agro-crops)। উইমকো দেশলাই কোম্পানীর বাগিচায় ৪/৫ মিটার দূরে দূরে লাগানো পপলার গাছের মাঝে মাঝে দিব্যি চাষ চলছে ধান, গম, ভুট্টা, সরষে, ছোলার। পর্ণমোচী পপলারের পাতা শীতে ঝরে গেলে রোদে ভরে যায় গমক্ষেত। জলদি বাড়ন্ত অ্যাকাশিয়ার জঙ্গলে আদা ও তেঁতুল ফলাচ্ছেন জোড়হাটের আসাম কৃষি বিদ্যালয়। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'আপনি কেক খাবেন, আবার সেটি তোলাও থাকবে, এ হতে পারে না'। আমাদের কৃষি-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে চলেছেন এ প্রবাদটি ভুল।

আর একটি নবতর বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির কাহিনী শুনুন। সুন্দরবন ও মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী কাঁথি এলাকার বালিয়াড়ী আবহাওয়ার কারণে ছিল এক-ফসলী। শুধু আমন ধানের চাষ হত। কৃষি বিভাগ তুলো, সুগারবিট, সূর্যমুখী, তরমুজ, লঙ্কা ও বাদাম নিয়ে চেষ্টা চালালেন দ্বিতীয় ফসলের। শেষ পর্যন্ত তরমুজ ধোপে টিকল। সাগর, নামখানা, কাঁথি, কাকদ্বীপের ঘরে ঘরে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে শুরু হল তরমুজের চাষ[৫]। হাসি ফুটল চাষীর মুখে। কিন্তু সে হাসি নিবে যেতেও দেরী হল না বেশী। উপকূলের এই সব প্রত্যন্তদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব মজবুত নয়। খুব একটা সুষ্ঠু বিক্রয় ব্যবস্থাও নেই। তরমূজের মত পচনশীল ফসল সামান্য একটু বেমরসুমী বৃষ্টিতেই সর্বনাশ ডেকে আনল চাষীর। ৮১ সালে চাষীরা অবিক্রিত পচা তরমুজ নদীতে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন; নৌকা চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। সেই থেকে বিজ্ঞানীরা তরমুজ সংরক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুনীত মুখার্জী তরমুজ থেকে গুড় করবার এক সরল প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন যা সুন্দরবনের বার্ষিক পাঁচ কোটি টাকার তরমুজ চাষকে এক নতুন আলো দেখাতে পারে।

ভারতে **পতিত জমির** পরিমাণ ৩ কোটি হেক্টর (ভূপৃষ্ঠের ৯·২ শতাংশ)। এই জমি চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. শুষ্ক ও অর্ধশুষ্ক মরু অঞ্চল (Arid & Semi-Arid),

২. লবণাক্ত ও ক্ষার অঞ্চল (Saline & Alkaline),

৩. পাথুরে বেহড় অঞ্চল (Ravine Region),

৪. নিচু জলাভূমি (Low lying Marsh)।

মরু অঞ্চলে চাষ করতে হলে বৃষ্টির পরই জমা জল যাতে বাষ্পীভূত না হয়, জঙ্গলে আবর্জনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে জমিকে এবং চাষের পর ফসলের গোড়াগুলি রেখে দিতে হবে জমিতে জল সংরক্ষণের জন্য। বপনের আগে বীজ অন্ধকার হাঁড়িতে সাতদিন ভিজিয়ে নিলে ও মাটিতে জলভর্তি মাটির সছিদ্র হাঁড়ি পুঁতে দিলে পরবর্তী সেচের আর প্রয়োজনই থাকে না। এইভাবে ওষধি, জ্বালানী, পশুখাদ্য জাতীয় নানান গাছ, তেল, রবার ইত্যাদির চাষ ভালভাবে চলবে।

লবণাক্ত অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকরা বলেন ঢালু জমিতে চাষ করতে, যাতে বর্ষায় জমির লবণ গড়িয়ে পড়া জলের সাথে ধুয়ে যায়। চুন ও লোহা গলানো স্ল্যাগ জমিতে ছড়ালে জমির লবণ ও ক্ষারভাব কমে আসবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভাল সেচ ব্যবস্থায় এই সব লবণ ধুয়ে ফেলা যায় যদি মাটি হালকা ও ঝুরো হয়। মাটি এঁটেল হলে বা সেচের জল লবণাক্ত হলে অবশ্য জল সংরক্ষণ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের মাটির উপযুক্ত ফসল তামাক, গম, বার্লি[৬]।

পাথুরে অঞ্চলে (পুরুলিয়া-বাঁকুড়ায়) কিছু কিছু পশুখাদ্য জাতীয় ঘাসের সাথে সৃষ্টি করা যায় ইউক্যালিপ্টাস, তেঁতুল ও সোনাঝুরির বন যা ধীরে ধীরে জমিকে করে তুলবে উর্বরতর।

নিচু জলাভূমিতে অ্যাজোলা এবং নীল সবুজ শ্যাওলার (Blue Green Algae) চাষ থেকে সরাসরি জৈবসার প্রস্তুতের এক পরিকল্পনা রচনা করেছেন দিল্লী আই. আই. টি.র গ্রামোন্নয়ন ও সঠিক-প্রযুক্তি কেন্দ্র। এইভাবে পরিবেশের প্রতি নজর রেখে নানা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ফলন বাড়ানোকেই আমরা বলছি বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি।

খ. এর পর নিবিড় জলব্যবস্থা (Integrated Water Shed Management Scheme) ও ন্যূনতম সেচ পদ্ধতি (Dry farming)। শুষ্ক চাষ পদ্ধতিতে খরা অঞ্চলে কিভাবে পাইপ ও ধারাযন্ত্রের (Spinkler, Drip etc.) মাধ্যমে সঠিকভাবে পরিমিত সেচ দিয়ে জল সংরক্ষণ করা সম্ভব তা আগেই বলা হয়েছে। এই সাথে যে সব জল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে

পারে তা হল: ১. নদী বক্ষের পলি কেটে (Dreging) নাব্যতা সৃষ্টি ও কাটা পলির কৃষিক্ষেত্রে সার হিসাবে ব্যবহার; ২. গভীর নলকূপের বদলে অগভীর নলকূপের প্রচলন এবং ৩. কৃত্রিম বৃষ্টির সাহায্যে সেচ।

পলি মাটি হচ্ছে রাসায়নিক সারের অতি সুলভ বিকল্প। এক হেক্টর জমিতে ৭৫ টন পলিমাটি লাগে। ইংল্যাণ্ডের ডন ও আমেরিকার টেনেসি নদী থেকে তোলা পলি কৃষিভূমিতে কাজে লাগানো হয় সার হিসাবে এবং ক্ষয়ে যাওয়া মাটির পরিপূরক হিসাবে। এই সঙ্গে বন্যা নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য তো আছেই। হলদিয়া ও কোলকাতা বন্দরের খালগুলির গভীরতা বাড়াবার জন্য সাড়ে চল্লিশ কোটি টাকার একটি মাস্টার প্ল্যান রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের, যার মধ্যে থেকে ৬ষ্ঠ যোজনায় খরচ ধার্য ছিল সাড়ে বারো কোটি। বছরে কাটা পলির পরিমাণ এক লক্ষ টন। সার হিসাবে বা জলা ভর্তি করার সঠিক কোন ব্যবস্থা না থাকায় এর ৯০% আবার নদীতে ফিরে আসে (ডাঃ রায় এই পলির আংশিক ব্যবহারে অতি সফলভাবে গড়ে তুলেছিলেন সল্ট লেক উপনগরী)। চাষে পলির ব্যবহারে ড্রেজিং-এর সমস্যাও কমবে। পলি দিয়ে ইট বানানোও যায়।

থাইল্যাণ্ডে আখ ও বাঁশবনে সেচের জন্য কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করে সফল হয়েছেন রয়্যাল রেন মেকিং রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভালাপমেন্ট ইনস্টিটিউট। এক এক দিনের বৃষ্টি নামানোর খরচ ৩৫ হাজার টাকার মত। কিন্তু ৮১-৮২ সালের প্রচণ্ড খরায় তাঁরা বাঁচাতে পেরেছেন সাড়ে তিন কোটি টাকার শস্য। খরাপীড়িত পশ্চিমবঙ্গে এধরনের কৃত্রিম বৃষ্টি কৃষি কাজে দারুণ সাহায্য করতে পারে, কারণ পশ্চিমবঙ্গের খরা অঞ্চলে (পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার পাথুরে মালভূমি) নলকূপ বা সেচনালা খনন ভূ-তাত্ত্বিক কারণে অসম্ভব।

গ. পরবর্তী অধ্যায় **সুষম সার বণ্টন** ও প্রাকৃতিক উপায়ে ফলন বৃদ্ধি। ক্ষতিকর তীব্র রাসায়নিক সারের পরিবর্ত হিসাবে পলির উল্লেখ আগেই করেছি। কিন্তু কেবল রাসায়নিক সারে ফসলের চাহিদা পূরণ হয় না। ফসলের প্রধান খাদ্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ অজৈব সারে পাওয়া গেলেও ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, লোহা, বোরন, তামা, জিঙ্ক—যেগুলি অতি অল্প মাত্রায় হলেও উদ্ভিদের জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান পেতে হলে নির্ভর করতে হয় জৈবসারের উপরেই। এছাড়া ভূমি সংরক্ষণের কাজেও জৈবসারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পচনশীল জৈবসার

থেকে যে অঙ্গারাত্মক গ্যাস বের হয় তা জলের সাহায্যে মাটিকে কার্বনিক অ্যাসিড মুক্ত করে তোলে। জৈবসার (সবুজ সার, কম্পোস্ট, স্লাজ, গোবরসার, খোল ইত্যাদি) এঁটেল মাটিকে যেমন হালকা ঝুরঝুরে করে, বেলে মাটিতে তেমনি আঁট ধরিয়ে বাড়ায় তার জলধারণ ক্ষমতা। ফলনের খাতিরে তো বটেই, ভূমি সংরক্ষণার্থেও জৈব-অজৈব সারের সুষম বন্টন একান্ত দরকার।

প্রাকৃতিক উপায়ে ফলন বৃদ্ধির উপায়গুলি পরিবেশ সংরক্ষণের একান্ত অনুকূল। এই বইয়ের অন্যত্র মৌ বাক্সে মৌমাছি পালনে কুল, লিচু, তিল, বেল, তেঁতুল, জামরুল, তাল, খেজুর, করমচা, শসা, সূর্যমুখী, কুমড়ো, বাঁধাকপি, সীম, সবেদা, লঙ্কা, আমড়া, ঝিঙে, কাঁকুড়, বরবটি, ঢ্যাঁড়স, পেঁয়াজ ইত্যাদির চাষে ফলন বাড়ানোর পদ্ধতি বিবৃত হয়েছে। এইরকম নানাভাবে **পুনর্বিনিয়োগ** (Recycling) পদ্ধতি অবলম্বনে ফলনও বাড়ে, পরিবেশ সংরক্ষণেও সহায়তা হয়।

ঘ. কীট ও আগাছা-নাশক নিয়ন্ত্রণ ভূমি সংরক্ষণের একটি প্রধান অঙ্গ। ডি. ডি. টি ব্যবহারের কুফল আমরা আগেই পড়েছি। এর পরিবর্ত হিসাবে বলা হয়েছে ক্ষতিকর কীট ধ্বংস করে এমন সব কীটাণু পালন করার কথা। জেনেছি কচুরীপানার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে ভারত আমেরিকা থেকে আমদানী করেছে একজাতের পোকা যা সব কচুরীপানা খেয়ে সাবাড় করবে। এছাড়া সৃষ্টি হয়েছে **তৃতীয় প্রজন্মের কীটনাশক** (Third Generation Pesticide)। এগুলি রাসায়নিক নয়, ইনসেক্ট হর্মোন যা কীট-পতঙ্গের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি এমনভাবে কমিয়ে দেবে যে তিনপুরুষের মধ্যেই তারা লুপ্ত হবে। অথচ এই ধরনের কীটনাশক প্রাণী জগতের বা মাটির পরিবেশগত কোন ক্ষতি করবে না। যেসব উপকারী কীট আছে, প্রয়োজন মত তাদের ধ্বংস এড়িয়ে যাওয়া চলবে। এজন্য অবশ্য প্রত্যেকটি প্রজাতির কীটের খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন, জৈবচক্র ও দৈহিক রসায়ন ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে জানতে হবে। আগাছা-নাশক সম্বন্ধেও ওই একই কথা খাটে। রাসায়নিকের উপর নির্ভর করা চলবে না। ধরুন একটা আগাছা জানথিয়াম স্ট্র্যামারিয়াম (Xanthium Strumarium)-এর ফুল ফোটে রাত্রের টানা অন্ধকারে। রাত্রে মাঝে-মধ্যে যদি এই আগাছার গায়ে টর্চের আলো ফেলা যায়, ফুল ফোটা ও বীজ হওয়া বন্ধ হয়ে আগাছার বংশবৃদ্ধিও শেষ হয়ে যায়। শস্য বদলের মধ্যে দিয়েও দমিত হয় জমির আগাছা বৃদ্ধি। এইভাবে সম্ভাব্য সকল

উপায়ে রাসায়নিকের ব্যবহার কমাতে পারলে কৃষিজমির দূষিত হওয়ার সম্ভাবনাও কমে আসবে[৭]।

৬. **সংরক্ষণ**—পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেই দেখেছি বালিখাদ করে কিভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে কৃষিজমি। শুধু বালিখাদ নয়, ইট ভাটা (১০নং চিত্র), চাষের জমিকে শিল্প বা আবাসনের জন্য ব্যবহারও কৃষি জমির সংরক্ষণের মূলে কুঠারাঘাত করছে। শিল্প বা আবাসনের মালিকরা তুলনামূলক ভাবে চাষীদের তুলনায় অনেক বেশী দাম দিয়ে কেড়ে নিচ্ছেন জমিগুলি। জমির মালিক পয়সার লোভে জমিকে কৃষিজমি থেকে শিল্প বা আবাসিক জমিতে পরিণত করতে বেশী আগ্রহী হয়ে পড়ছেন। এই প্রবণতাকে আইন করে দৃঢ় হাতে দমন না করলে আমাদের কৃষিজমির পরিমাণ ভয়াবহ ভাবে কমে যাবে। সারা পৃথিবী যখন সিণ্ডার ফ্লাইঅ্যাশ বা ফাঁপা কংক্রিট দিয়ে ইট বানাচ্ছে, আমরাই একমাত্র ধান জমিকে ছারখার করে পোড়া মাটির সাবেকী ইঁটে গড়ে তুলছি আমাদের হিমালয়প্রমাণ মূর্খতার সৌধ। আমাদের স্থপতিরা জানেন কিনা জানি না, আজ থেকে ৪০ বছর আগে অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ৩৫ একর ব্যাপী ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ক্যাম্পাসে প্রতিটি বাড়ীর দেয়াল তৈরী করেছিলেন সিণ্ডারের তৈরী ইঁটে। এগুলি চমৎকার ভাবে কাজ করে চলেছে আজও অথচ যিনি এই ব্লকগুলি তৈরী করেছিলেন, প্রশান্তবাবুর অবর্তমানে চাহিদার অভাবে তাঁকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে হয়েছিল বম্বে যেখানে তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর লুপ্ত কদর।

এইভাবে সর্বাত্মক চিন্তা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমেই হতে পারে সত্যিকার ভূমি সংরক্ষণ। সে প্রচেষ্টার অন্তর্গত হবে বন-মহোৎসব থেকে সিণ্ডারের হল-ব্লক তৈরী সব কিছুই।

মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয়, থাক পরম পাওয়ার এষণা।
চারা পোঁতাটাই নয়কো আসল সত্য,
আছে কিনা দেখো হৃদয়ের আনুগত্য।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

সেই আনুগত্যই আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে মাটি-জল-বায়ুর এষণা।

---

১. ডঃ পি. সি. ডেকা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, জোড়হাট, ২. অ্যালবার্ট ফস্টার, ৩. জন সংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ., ৪. ডঃ নিশীথরঞ্জন কর, ৫. আজকাল পত্রিকা, ৬. ডঃ পি. সি. ডেকা, ৭. ডঃ তারকমোহন দাস।

মানবক গাড়ী কিনেছে। খবর পেয়ে শ্রীভগবান তাকে চিঠি দিলেন—"কল্যাণবরেষু পুত্র মানবক, রথ ক্রয় করিয়াছ; প্রীত হইলাম। নিম্নোক্ত উপদেশগুলি মানিয়া চলিয়ো। তোমার সাশ্রয় হইবে ও নগরের বায়ুমণ্ডলী নির্মল থাকিবে। (১) রথ যত ধীর বেগে চালাইবে বায়ু তত কম বাধা দিবে, তেল কম খরচ হইবে। বেগ ঘণ্টায় ৪০ কি.-মি. এর উপর তুলিয়ো না। (২) চলিবার কালে ব্রেক বা ক্লাচে পা রাখিবে না। হঠাৎ ব্রেক না দিয়া আগে হইতে গতি কমাইয়ো। অযথা ব্রেকের ঘর্ষণে তৈলজ্বলন ও ধূম্রোৎপাদনের আধিক্য বুঝায় (৩) স্পার্ক প্লাগের সঠিক 'গ্যাপ', ইঞ্জিনের সঠিক টিউনিং, চাকায় বাতাসের

৭ সংরক্ষণ ঃ জলবায়ু
Conservation of Water & Air

সঠিক পরিমাণ, ধূলিহীন পরিষ্কার 'এয়ার ফিল্টার', 'সাইলেন্সার' ও 'একজস্ট' তৈল এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক। (৪) পেট্রল ট্যাঙ্কের ঢাকনা আঁট করিয়া রাখিবে, রথ ছায়ায় 'পার্ক' করিবে—পেট্রল বাতাসে মিশিবে না। (৫) সঠিক গ্রেডের 'লুব্রিকেণ্ট' ব্যবহার, চাকার সঠিক 'অ্যালাইনমেণ্ট' তৈল খরচ কমায়। এক মিনিটের বেশী দাঁড়াইতে হইলে ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিবে। (৬) গমন পথ আগেই 'প্ল্যান' করিয়া রাখিবে। জ্যাম অপেক্ষা ঘোরা পথে তৈল ব্যয় ও বায়ু দূষণ কম হয়। (৭) রথের কালো ধূম্র তোমার নোট পুড়াইয়া সৃষ্টি হয় তোমার পুত্র-কন্যাকে তিলে তিলে হত্যার্থে। ইতি আশীর্বাদক শ্রীভগবান।"

ভূমিসংরক্ষণের পরই **জলসংরক্ষণ**। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কি ভয়ানক ভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে আমাদের নদ-নদী-খাল-বিল। আমাদের দামোদর ভাগীরথীর অবস্থা তো অতি শোচনীয়। ১৯৭৭ সালে আর্জেন্টিনার মারডেল প্লাটায় আন্তর্জাতিক জল সম্মেলনে ৮০-এর দশককে নির্মল পানীয় জল ও শুচি ব্যবস্থার দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে যার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পরিস্রুত জল পৌঁছে দেবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ সার্বিক ভাবে জল সংরক্ষণের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আমরা আগেই দেখেছি নদী বা হ্রদের দূষণ যদি একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে থাকে তাহলে জল সূর্যরশ্মি, বায়ু, অক্সিজেন, গুল্ম, বায়ুজীবী ও অবায়ুজীবী জীবাণু কণার সাহায্যে নিজেই নিজেকে দূষণমুক্ত করতে পারে[১]। এইভাবে নদ-নদীর জলকে নির্মল রাখতে হলে ঃ

ক. নদীর প্রবাহ পথে দূষণ পদার্থ ও দূষিত জল ফেলা বন্ধ করতে হবে।

খ. জলে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়াবার পন্থাগুলিকে জোরদার করতে হবে।

গ. প্রাকৃতিক শোধন ক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরের কাজগুলি যাতে সঠিক ভাবে হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ঘ. পলি তুলে নাব্যতা বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক শোধন ব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

ঙ. শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। তা না হলে জল ঘোলাটে, ফেনাযুক্ত, আঁশটে হবে ও তাতে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেবে। জলচর প্রাণীর (মাছ ও পোকা) সংখ্যাও কমতে থাকবে।

গঙ্গার ইলিশ, পুকুরের রুই-কাতলা ও মোহনার রকমারী মাছে আজ-কাল দারুণ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তার প্রধান কারণ জল দূষণের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে বাতাস এবং জলজ জীবাণুর সাহায্যে জল কোন স্তরেই শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারছে না। এই দূষণ তিন প্রকারের ঃ

১. ভৌত গুণমানের ঘাটতি।

২. রাসায়নিক গুণমানের ঘাটতি।

৩. জীবাণু কণার ঘাটতি।

১. **ভৌত গুণমান** (Physical Property)—এর মধ্যে রয়েছে জলের আবিলতা (Turbidity), রং (Colour), স্বাদ (Taste), গন্ধ (Odour)। জলের মধ্যে সূক্ষ্ম ভাসমান পদার্থ ও কলয়েড জাতীয় পদার্থের কমবেশী হলে আবিলতা মানের হেরফের ঘটে। পানীয় জলে এই মান ১০ পি. পি. এম.-এর বেশী হওয়া উচিত নয়। জলে রং বদল হয় খনিজ পদার্থের দরুন। যেমন লোহার উপস্থিতি জলকে লালচে করে তোলে। পানীয় জল বর্ণহীন হওয়া প্রয়োজন। জৈবিক পদার্থের উপস্থিতি স্বাদ ও গন্ধের তারতম্য ঘটায়।

২. **রাসায়নিক গুণমান** (Chemical Property)—ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের কার্বনেট, বাই-কার্বনেট, সালফেট, নাইট্রেট, ক্লোরাইড ফ্লোরাইড এবং ম্যাঙ্গানিজ ও আইরন অক্সাইড জলের রাসায়নিক গুণাবলী নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **জীবাণুভিত্তিক গুণমান** (Bactrological Property)—প্যাথজেনিক জীবাণুর সংখ্যার উপরই জলের জীবাণুমান নির্ভরশীল। জীবাণু সংখ্যার সূচকমানকে বলা হয় বি-কোলাই ইনডেক্স। পানীয় জলে বি-কোলাই ইনডেক্স ১০ ছাড়ালে চলবে না।

এই তিন ধরনের দূষণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জলে ভিন্ন ভিন্ন। নিচের সারণীতে এইসব মাত্রার তুলনা দেওয়া হল[২] :

১৩নং সারণী

	পানীয় জল	স্নানের জল	সেচের জল
আবিলতা	১০ পি. পি. এম.	—	—
রং ও গন্ধ	বর্ণহীন/গন্ধহীন	—	—
কঠিন ভাসমান পদার্থ	১০০০ পি. পি. এম.	—	২১০০ পি. পি. এম.
পি. এইচ. মান	৬·৭-৭·৯	৬·০-৯·০	৫·৫-৯·০
খরতা (Hardness)	১০০-২০০ পি. পি. এম	ঐ	ঐ
অক্সিজেন (দ্রবীভূত)	লিটারে ৬ মি. গ্রা.	লিটারে ৩ মি. গ্রা.	লিটারে ৩ মি. গ্রা. (মাছ চাষের জন্য)

	পানীয় জল	স্নানের জল	সেচের জল
অ্যামোনিয়া	১ পি. পি. এম -এর কম	—	১'২ পি. পি. এম.
ক্লোরাইড	২৫ পি.পি. এম.-এর কম	৬০০ পি.পি. এম.	৬০০ পি. পি. এম.
সালফেট	শূন্য	—	১০০০ পি.পি. এম.
ফেনল	'০০১ পি.পি. এম.	'০০৫ পি.পি. এম.	—
ফ্লুরাইড	১ পি.পি. এম.	১'৫ পি.পি. এম.	—
বি-কোলাই	১০	৫০০০-এর কম	—
বি. ও. ডি.	৫ পি.পি. এম.	৩ পি.পি. এম.	—

বিভিন্ন কাজে ব্যবহার্য এই সব জলের গুণমান, বিশেষতঃ পানীয় জলের গুণমান যথাযথভাবে পেতে হলে জলকে বিভিন্ন উপায়ে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ১৪নং সারণীতে বিভিন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং দূরীভূত দূষণকের পরিচয় দেওয়া হল[৩] :

১৪নং সারণী

শোধন পদ্ধতি	দূরীভূত দূষণকের পরিচয়
বায়ু সংযোজক আধার (Aeration Tank)	বাতাসের বুদবুদ জলের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস এবং লোহা, ম্যাঙ্গানীজ জাতীয় খনিজ পদার্থ দূর করে। দূর করে জলে মিশ্রিত পচনশীল জৈবকণা যা দুর্গন্ধময় ও বিস্বাদের সৃষ্টি করে।
থিতানোর আধার (Sedimentation Tank)—প্রাথমিক	সাধারণভাবে বড় ও ভারী ভাসমান পদার্থ দূর হয়। তবে যখন ট্যাঙ্কে কোয়াগুল্যাণ্ট জাতীয় রাসায়নিক যোগ করা হয় তখন হাল্কা ও খুব মিহি ভাসমান পদার্থও দূর করা সম্ভব হয়।

শোধন পদ্ধতি	দূরীভূত দূষণকের পরিচয়
পরিস্রাবক আধার (Filtration Tank) ও শোধন আধার (Dis-infection Tank)	খুব সূক্ষ্ম মাপের কলয়েড জাতীয় পদার্থ অণুবীক্ষণমানের জীবাণু ও ব্যাক্টিরিয়া (প্যাথোজেনিক, প্রটোজোয়া ও ভাইরাস জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া) দূর হয়।
রাসায়নিক থিতানো ও বিশেষ বায়ু সংযোজন ব্যবস্থা (Chemical Precipitation & Special Aeration)	থিতানোর আগে রাসায়নিক মিশ্রণে ক্ষার জাতীয় লবণ, খনিজ অম্লাত্মক জৈব পদার্থ, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ ও ফ্লোরাইড জাতীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগসমূহ দূর হয়। বিশেষ ধরনের অ্যাকটিভেটেড কার্বন ও বায়ু সংযোজনে জল গন্ধহীন ও মিষ্ট স্বাদযুক্ত হয়ে ওঠে।

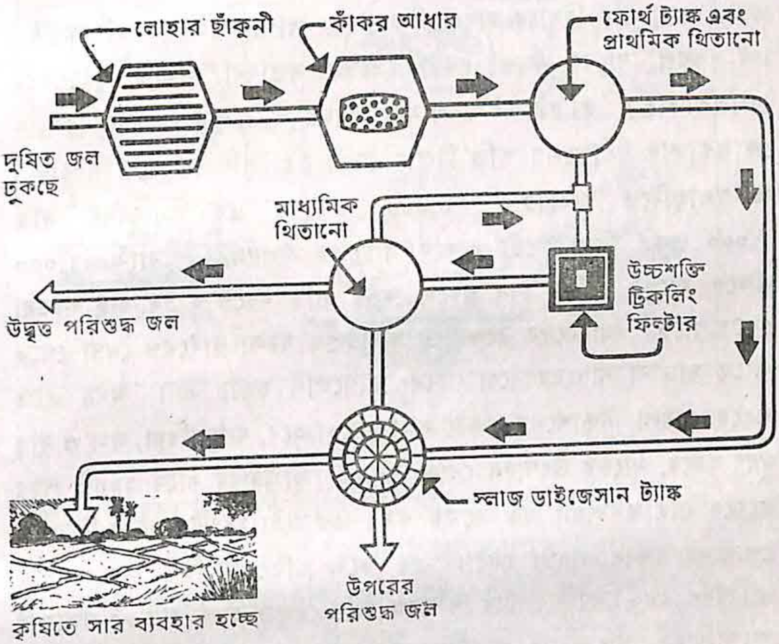
যে কোন শহরে নাগরিকদের জন্য নদী বা হ্রদ থেকে জল সংগ্রহ করে জল-কার্যালয়ে (water works) এইভাবে তাকে শোধন করে তোলা হয় উঁচু ওভার হেড ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে প্রয়োজন মত জল ছাড়া হয় যা পাইপের মাধ্যমে পৌঁছায় ঘরে ঘরে। এর নাম পৌর জল সরবরাহ ব্যবস্থা। ঠিক এরই সঙ্গে সঙ্গে বহু নগরেই রয়েছে একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা যাকে বলা হয় নাগরিক শূচি ব্যবস্থা (Urban Sewage System)। সব রকমের ধৌত-পরিত্যক্ত দূষিত জলের সমষ্টিগত নাম সিউয়েজ বা বারি-বাহিত-ময়লা। মানুষ ও পশুর দেহ-ধৌত নোংরা জল, মল, মুত্র, ঘরোয়া কাপড়-কাচা বা বাসন ধোয়ার ময়লা জল, মাঠ-ঘাট-পথ-নালা দিয়ে বয়ে আসা কাদা ঘোলা জল, এমন কি কল-কারখানার আবর্জনা মিশ্রিত নোংরা জল—এই সবের যৌথ নাম **সিউয়েজ**। এর মধ্যে স্নান-পাইখানার পরিত্যক্ত ময়লাকে বলা হয় স্যানিটারী সিউয়েজ ও বৃষ্টির দূষিত জলকে বলা হয় স্টর্ম-ওয়াটার সিউয়েজ। আগেকার দিনে এগুলি একসাথে পরিবাহিত হত। প্রাচীন শহর, যথা—কোলকাতার নালা-নর্দমা সেই ভাবেই তৈরী। আধুনিক ডিজাইনে, যথা—সল্টলেকে এই দু ধরনের সিউয়েজ পরিবহণের আলাদা

আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। এর প্রধান কারণ এই দুই শ্রেণীর সিউয়েজের গঠন চরিত্র, ক্ষতিকারকতার মান ও দূষণের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। এর ফলে স্যানিটারী সিউয়েজের পরিবহণ ব্যবস্থা যত পাকাপোক্ত করে তৈরী করতে হয় গভীর সাবধানতা সহকারে, অপর ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। ক্ষেত্র-বিশেষে তা খোলা নর্দমা দিয়েও বহন করা যায়। দুই ধরনের সিউয়েজের দূষণক উপাদানের একটা তুলনা ১৫ নং সারণীতে দেওয়া হল। মানুষ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে শর্করা (Carbohydrate), তৈল জাতীয় স্নেহপদার্থ (Oil & Fat), প্রোটিন (Protein), কিছু খনিজ পদার্থ (Minerals) এবং খাদ্যপ্রাণ (Vitamin)। এর প্রয়োজনীয় অংশ দেহ গ্রহণ করে ও অবশিষ্টাংশ মল, মূত্র, ঘাম, কফ, পুঁজ ইত্যাদির আকারে দেহ থেকে বেরিয়ে এসে স্যানিটারী সিউয়েজের রূপ ধারণ করে। স্বাভাবিক কারণেই এই জাতীয় সিউয়েজে অণুবীক্ষণমানের বহু জৈব ও অজৈব দূষণক পদার্থ থাকে। অন্যদিকে বৃষ্টির জল রাস্তাঘাট ধুয়ে কাগজ, কাপড়, ছাইপাঁশ কাঠকুটো, লতাপাতা বহন করে আনে। এগুলিকে সহজে আলাদা করা যায় ও এই জাতীয় সিউয়েজের শোধন ক্রিয়াও স্বভাবতই সহজ ও সস্তা।

১৫নং সারণী

সিউয়েজের উপাদান	স্যানিটারী সিউয়েজ	স্টর্ম-সিউয়েজ
মোট কঠিন বস্তু	১৫৩০ পি. পি. এম.	৪১৪ পি. পি. এম.
মোট দ্রবীভূত কঠিন বস্তু	১১৪৫ ”	৩১৬ ”
মোট ভাসমান কঠিন বস্তু	৩৮৫ ”	৯৮ ”
জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন মান	৪২০ ”	৯৫ ”
অক্সিজেন গ্রহণ মান	২৭০ ”	৭০ ”
মোট নাইট্রোজেন	৪০ ”	১২ ”
অ্যামোনিয়া	২৪ ”	৮ ”
ক্লোরাইড	৮০ ”	১৮ ”
সালফেট	৩৪ ”	২৪ ”
মোট ক্ষারের পরিমাণ	৫৮ ”	৩৪ ”

১৬নং নকশায় সিউয়েজ শোধনের ক্রমিকটি দেখানো হয়েছে[৪]। প্রথমে একটি লোহার ছাঁকনী দিয়ে ভাসমান গাছ, পাতা, ডাবের খোলা, পশু-পাখীর মৃতদেহ, কঙ্কাল ইত্যাদি বড় মাপের কঠিন বস্তু বাছাই করে ফেলা হয়। তারপর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পাথরের নুড়ি ভর্তি গ্রিট চেম্বারে যেখানে আটকে যাচ্ছে পচনশীল অজৈব দূষণক। পরবর্তী ট্যাঙ্ক হচ্ছে স্কীম

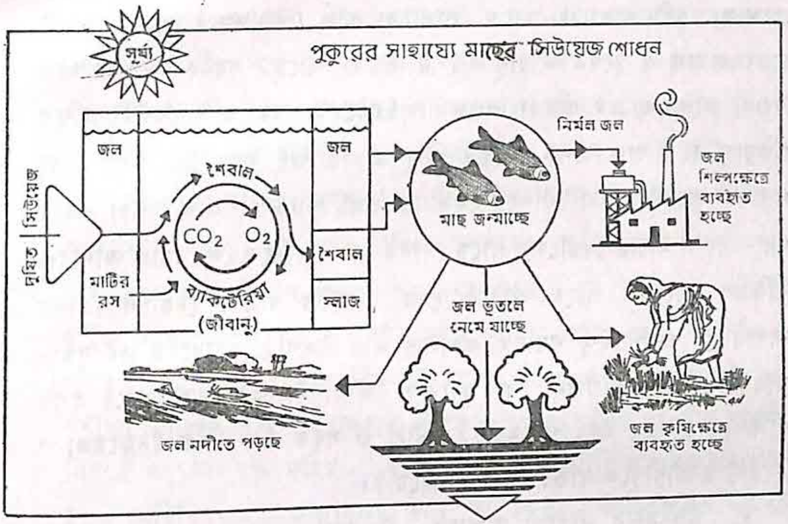


নকশা নং-১৬

বা ফর্থ ট্যাঙ্ক। এখানেও আটকাচ্ছে অজৈব দূষণক এবং তেল ও চর্বিযুক্ত ভাসমান ময়লার কণা। এবার তরলতর সিউয়েজ যাচ্ছে প্রাথমিক থিতানোর আধারে (Primary Settling Tank)। এখানে জলের শান্ত ভাবের দরুন বড় মাপের জৈব কণাগুলি জলাধারের তলদেশে জমা হয়। এরপর ময়লা জলকে যেতে হচ্ছে একসার উচ্চশক্তিবিশিষ্ট ট্রিক্লিং ফিল্টারের ভিতর দিয়ে যেখানে আটকে যাচ্ছে ও আলাদা হয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্ম ভাসমান জৈবিক কণাগুলি। পাতলা হয়ে আসা ময়লা জলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মাধ্যমিক থিতানোর আধারে (Secondary Settling

Tank)। যেখানে সৌরালোক ও পার্থিব অভিকর্ষে মিশ্রিত কলয়েড জাতীয় দূষিত অণুবীক্ষণ মানের পদার্থকণাসমূহ থিতিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন ট্যাঙ্কে থিতানো কঠিন বস্তুকে পাঠানো হয় স্লাজ ডাইজেশান ট্যাঙ্কে যেখানে বায়ুহীন অন্ধকার বন্ধ ট্যাঙ্কের তাপে রূপান্তর ঘটে এই ময়লার। সেটলিং ট্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসা তরল অংশকে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয় কৃষিক্ষেত্রে তরল জৈব সার হিসাবে,—যেমন কোলকাতার পৌর অঞ্চলের তরল ময়লা সার হিসাবে ব্যবহার করা হয় ধাপার বিস্তীর্ণ কপিক্ষেতে। এই তরল সারের আর একটা ভিন্নতর সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষতঃ কোলকাতায়। তা হল এই তরল সার মাছের অতি পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে কোলকাতার পূর্বাঞ্চলের অতি বিস্তীর্ণ ভেড়ী (যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ) ও জলাভূমিতে ব্যবহার। ২০,০০০ একরের এই জলাভূমির মাত্র ৩,০০০ একর নিয়ে তৈরী হয়েছে সল্টলেক উপনগরী। বাকি ১৭,০০০ একরে মাছের নিবিড় চাষ করলে হেক্টর প্রতি বছরে ৩ টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। মাছেদের একেবারে অপরিশুদ্ধ ময়লা খাইয়েও দেখা গেছে তাতে মাছ বা মানুষের মধ্যে কোন রোগভোগ ছড়ায় না। অথচ এতে শহরের ময়লা নিষ্কাশনের একটা সস্তা সুরাহা হবে, ম্যালেরিয়া, জল ও বায়ু দূষণ কমবে, মাছের উৎপাদন বেড়ে উঠবে। ভাগীরথীর ধারে ১৯০টি শহর রয়েছে যার জনসংখ্যা এক লক্ষের কম। এর মধ্যে ১৪৭টি শহরের সিউয়েজ শোধনের কোন ব্যবস্থা নেই। এর ফলে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার বুকে প্রতিদিন ৩০০ কোটি লিটার সিউয়েজ ঢেলে দেওয়া হচ্ছে যার ৮৫ শতাংশই অশোধিত। পশ্চিমবঙ্গে অশোধিত সিউয়েজের সাহায্যে সামগ্রিক ভাবে মাছ চাষের মাস্টার প্ল্যান রচনা করতে পারলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা সম্ভব হবে। ১৭ নং নকশায় এই ধরণের মাছ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মাছ-পুকুরের পরিকল্পনা দেওয়া হল। এই মাছ চাষকে ভিন্নতর পরিবেশ সংরক্ষণের কাজেও লাগানো যায়। তা হল সুন্দরবনের সুদূরপ্রসারী অনাবাদী নোনা জলের ভেড়ী। লবণাক্ততার দরুন এখানে চাষ অসম্ভব। উৎপাদক-গ্রাহকের অভাবে পরিবেশগত ভারসাম্য ক্রমাগত টলে পড়ছে। এক্ষেত্রে মাছ চাষে স্থানীয় অর্থনীতিই শুধু নয়, পরিবেশেরও পুষ্টি সাধন হবে। এ ব্যবস্থা চালু হচ্ছে ঝড়খালিতে (৫৫০ হেক্টর) ও মহিসিনীতে (৪৩০ হেক্টর) আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায়। খড়্গপুরের

আই. আই. টিতে জল-বিজ্ঞান বিভাগে যে গবেষণার সূচনা করা হয়েছে সম্প্রতি তাও এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখাবে (১১নং চিত্র)।



নকশা নং-১৭

কেন্দ্রীয় জলদূষণ নিরোধক বোর্ড ভাগীরথীর দূষণ নিয়ে খুবই চিন্তিত। তাঁরা এ ব্যাপারে সম্প্রতি যে সার্ভে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলেছেন :

১. বিভিন্ন শহরের খাটালগুলি নদী দূষণের একটা প্রধানতম কারণ। এগুলিকে শহরের বাইরে কৃষি এলাকায় নিয়ে যেতে পারলে শহরের নোংরাও কমবে, আবার খাটালের আবর্জনা থেকে জৈব সারের যোগান দেয়া যাবে কৃষিক্ষেত্রে।

২. অধিকাংশ শহরেরই সিউয়েজ শোধন ব্যবস্থা নেই বা কার্যকর নয়। এগুলি সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা ও কাজে লাগানো না হলে আমাদের নদী দূষণের উন্নতি অসম্ভব।

৩. শিল্পগুলির নিজস্ব পরিশোধন ব্যবস্থা খুবই সামান্য। ফলে নদীর জলে অবাধে মিশছে ক্যাডমিয়াম, পারা, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, ফেনল, সাইনাইড ও পেট্রলজাত রাসায়নিক। এগুলি মাছ ও মানুষ উভয়ের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিকর। জল দূষণ রোধক আইনে দূষণের জন্য তিরস্কার

রয়েছে বটে কিন্তু রোধের জন্য কোন পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। ফলে পরিশোধনে শিল্পপতিদের খুব একটা আগ্রহ নেই। কচুরী পানার এইসব শিল্প আবর্জনার কিছু কিছু শোষণ করে নেবার ক্ষমতা আছে[৫]। সস্তার শোধন ব্যবস্থায় কচুরী পানাকে কাজে লাগানো যায় (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তুলসী পাতারও জল ও দুধের জীবাণু নাশের ক্ষমতা আছে। সূর্যের আলোর অতি বেগুনী রশ্মিরও এই ক্ষমতা আছে। সূর্যগ্রহণের সময় অতি বেগুনী রশ্মির পরিমাণ কমে যায় বলে, সনাতন হিন্দু প্রথায় ওই সময় দুধ, জল, রান্না খাবারে তুলসী পাতা মিশিয়ে দেওয়ার প্রথা আছে। আর একটা মজার কথা—দেখা যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে গোবর মাখিয়ে দিলে সে দেয়াল আণবিক বিকিরণ আংশিক ভাবে আটকে দেয়। মাটির বাড়ীর দেয়ালে গোবর লেপার যে প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত তার উৎপত্তি গোবরের এই দূষণ-রোধক ধর্ম থেকে কিনা কে জানে? জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে হলুদ ও কমলা রং-এর কাঁচ পাত্রেরও। নীল ও সবুজ কাঁচ কিন্তু ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ডিসেণ্ট্রির জীবাণুকে বাড়তে সাহায্য করে)।

৪. ভাগীরথীর নাব্যতা বাড়াতে গ্রীষ্মকালে ফরাক্কা থেকে প্রবাহিত জলমাত্রা বাড়াতেই হবে। প্রবাহের গতি না বাড়লে পলি পড়ে দূষণ ও বন্যার প্রকোপ বেড়েই চলবে (প্রকৃতপক্ষে পাকাপাকি ভাবে বন্যা এড়াতে হলে দেশের সমস্ত নদনদীকে পাইপ ও খালের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে একটি জাতীয় জল-গ্রিড গড়তে হবে। এ ব্যাপারে ভারত সরকার একটি ৫০০০ কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান হাতে নিয়েছেন। পরিকল্পনা রূপায়ণে সহায়তা করবেন রুশ বিশেষজ্ঞরা)।

জলদূষণ রোধের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে সমুদ্র গবেষণার। আগামী দিনে সমুদ্র আমাদের যোগাবে খাদ্য, তেল, বিদ্যুৎ, তাপ, খনিজ সম্পদ এবং হয়ত বা নিরাপদ আবাসন। ভারত মহাসাগরে মাঙ্গানীজ, নিকেল, ইউরেনিয়াম, সোনা, টিন ও হীরের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে[৬]। ভারতের ৬০০০ কি.মি. দীর্ঘ তটভূমি থাকায় এই সম্পদ আহরণের সুযোগ আমাদেরই সবচেয়ে বেশী। আন্দামান নিকোবরে রয়েছে তেল। সামুদ্রিক খাদ্য তো আজ পুরানো কথা হয়ে গেছে। এমন কি, বিজ্ঞানীরা এখন ভাবছেন জনসংখ্যা বেড়ে উঠলে বা পারমাণবিক দূষণ এড়াতে হলে সমুদ্রের ভিতর

ডুবো জাহাজের মত ১৪০ মিটার গভীরতায় প্লাস্টিকের ঘরবাড়ী গড়ে তোলা যাবে। নমুনা হিসাবে তৈরী হচ্ছে অ্যামেরিকার টেকটাই অ্যাণ্ড সি-ল্যাব প্রোজেক্ট[৭]। ভারতের ১৯০০ টন ওজনের সামুদ্রিক গবেষণা জাহাজ 'গবেষণী' তার র‍্যাডার, ইকো-সাউণ্ডার, ডীপ-সি ক্যামেরা, বুমেরাং ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে নেমে পড়েছে গবেষণার কাজে। ভবিষ্যতে সমুদ্রের তলদেশে সিসমোমিটার বসানোর পরিকল্পনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জল সংরক্ষণের পরবর্তী চিন্তা **বায়ু সংরক্ষণ**।—'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু' তাদের অপসারিত, নির্বাসিত করা। পৃথিবীর আবহাওয়া বদলাচ্ছে। আগামী দিনে পার্থিব জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য মানুষই সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে মানুষ যে বিরাট পরিবর্তনের ঝুঁকি নিচ্ছে তাতে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে আবহাওয়ার এমন পরিবর্তন হতে পারে যে প্রাণীকুলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যানবাহন ও শিল্পজাত দূষণক পদার্থ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মিশছে আশঙ্কাজনক হারে। আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক প্রকল্পগুলির ফলও হয়ত অবিমিশ্রভাবে কল্যাণকর হবে না, যেমন—আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় সাহারা মরুভূমিকে সজল শ্যামল করে তোলার পরিকল্পনা। সাহারা থেকে ভেসে আসা উত্তাপে ইউরোপের গ্রীষ্ম ও বসন্তের সৃষ্টি। গাছপালা এ উত্তাপ শুষে নিলে, ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি মেরু প্রদেশের মত চির-তুষারাচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে। রাশিয়া সাইবেরিয়ার নদী (ওব, ইউনেসি ও লেনা)-গুলিকে তুষারমুক্ত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যাতে মেরু-প্রদেশের তুষারও বেশ খানিকটা গলে যাবে। এতে সামুদ্রিক প্লাবন দেখা দিতে পারে যা ইউরোপ ও আমেরিকার পক্ষে হবে বিপজ্জনক। কলকারখানা ও যানবাহন থেকে বেরুনো কার্বন ডাই-অক্সাইড ক্রমাগত বায়ুমণ্ডলে মেশার ফলে আগামী অর্ধশতাব্দীতে আবহমণ্ডলের তাপ ৩° সে. বাড়বে। এর ফলেও মেরু প্রদেশের বরফ গলে বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক প্লাবন দেখা দিতে পারে।

মোট কথা, মানুষ নিজেই তার বাতাসকে বিষিয়ে তুলছে। এজন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ঃ

ক. পারমাণবিক পরীক্ষা—ছড়াচ্ছে তেজস্ক্রিয়তা।

খ. কলকারখানা—ধোঁয়ার মাধ্যমে উপহার দিচ্ছে অঙ্গার ও অম্লজাতীয় বিষ ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস।

গ. যানবাহন—ছড়াচ্ছে ইঞ্জিন-পরিত্যক্ত কার্বন।

ঘ. সবুজের অভাব—শুষে নিতে পারছে না ক্রমবর্ধমান কার্বন ডাই-অক্সাইড।

ঙ. ক্রমবর্ধমান মানবগোষ্ঠী—চাপাচাপি গাদাগাদির মাঝে বাতাসকে করে তুলছে আরো মলিন, আরো দূষিত।

এ ছাড়াও রয়েছে আর এক ভিন্নতর দূষণক-শব্দ (Noise)—যা আবহ-মণ্ডলীকে দূষিত করছে এক ভিন্নতর স্তরে। শব্দের অত্যাচারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ছে মানুষের স্নায়ুমণ্ডলী। দেখা যাচ্ছে ভালভাবে বাঁচার আকুতিতে মানুষ সৃষ্টি করছে পরিবেশ দূষণ নামক আত্মহত্যার পথ।

এই সব দূষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে চলেছে নানা চেষ্টা। যেমন ধরুন,

ক. চীনের রাজধানী পেইচিং-এ শুরু হয়েছে পরিবেশকে মুক্ত রাখার অভিযান। সেখানে বিদেশী কূটনীতিক ছাড়া কাউকে কুকুর পুষতে দেওয়া হয় না। গাড়ীর ধোঁয়া এড়াতে যানবাহন হিসাবে সাইকেলের উপরই জোর দেওয়া হয় বেশী। কান ফাটানো হর্ন ও কারখানার যান্ত্রিক শব্দ কমাবার জন্য শুরু হয়েছে প্রচার। রাস্তায় থুথু ফেললে জরিমানা হয় ২৫০ টাকা। পার্কে, বাজারে ঠোঙ্গা, প্যাকেট, আইসক্রীম কাপ যত্রতত্র ছড়ানো বেআইনী। বাড়ী তৈরীর সিমেণ্ট বালিও রাস্তায় বা ফুটপাথে রাখা নিষিদ্ধ। সম্প্রতি পেইচিং-এ মুরগী ও পায়রা পোষাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

খ. জ্বালানী খরচ ও আনুষঙ্গিক দূষণের মাত্রা কমাতে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশের ৪০ কোটি মানুষ ১৯৮২ সালে ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা এগিয়ে দিয়েছেন। কাজের সময় সীমিত হওয়ার ফলে কেবল ফ্রান্সেই ৩ লক্ষ টন তেল কম পুড়বে। অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে আছে ব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, গ্রীস ইত্যাদি।

গ. মস্কো শহরে সিলিণ্ডারের তরলায়িত পেট্রল গ্যাস (L. P. G.) দিয়ে গাড়ী চালানো হচ্ছে। অন্ততঃ ৩,০০০০ গাড়ী এপর্যন্ত গ্যাসে চলতে শুরু করেছে। এতে পরিবেশ দূষণের তীব্রতা ৭০/৭৫ ভাগ কমে যাচ্ছে। এছাড়া কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ কমানোর জন্য নতুন ধরনের কারবোরেটারের ব্যবস্থা হয়েছে।

ঘ. ফ্রান্সের পিরানিজ পর্বতের ১৮৭০ মিটার উচ্চতায় ৬ হেক্টর জমি জুড়ে ২৩ কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয়ে ১৭৫০০ বর্গমিটার আয়তনের আয়নার সাহায্যে ২·৫ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন সৌরশক্তি প্রকল্পটি চালু হয়েছে পরিবেশ দূষণ এড়াতে।

ঙ. আমেরিকা শুরু করেছে সিনথেটিক বা কৃত্রিম খাদ্য নিয়ে গবেষণা। এছাড়া চলছে সিঙ্গল-সেল-প্রোটিন সৃষ্টির চেষ্টা। প্রফেসার পাইক তাঁর সিনথেটিক ফুড বইতে জৈব যৌগ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরাসরি খাদ্য নির্মাণের কথা (অর্থাৎ পরিবেশগত উৎপাদক-গ্রাহক চক্রটি বাদ দিয়ে) বলেছেন।

চ. ১৯৮৪ সালে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা সম্মেলন হয়েছে। সেখানে উপস্থাপনার জন্য শ্রীলঙ্কা যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার ফলে সেখানে মৃত্যু হার, শিশু বিবাহ হার ও গ্রাম ছেড়ে নগর বাসের হার কমছে, বাড়ছে বয়স্ক বিবাহের হার ও জনপ্রতি রোজগারের হার। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমের দিকে।

ছ. ওয়াশিংটন ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিটিউটের সমীক্ষা অনুযায়ী ব্রাজিলে গাড়ীর সংখ্যা ৭২ লক্ষ, তৃতীয় বিশ্বে সর্বাধিক। শহরের জঞ্জাল ও কৃষি আবর্জনা থেকে তৈরী পেট্রলের বিকল্প মিথানলে আবহমণ্ডলের কোনরকম দূষণ হয় না। ইথানল উৎপাদনে ব্রাজিল অগ্রণী। সেখানে ২০% মোটর এখন ইথানলে চলে। ব্রাজিলের প্রধান কৃষিপণ্য আখ থেকে তৈরী হচ্ছে ইথানল। ১৯৯৫-এর মধ্যে দেশের প্রতিটি পেট্রল ইঞ্জিন ইথানলে চালাবার চেষ্টা করছে ব্রাজিল।

আমাদেরও থেমে থাকলে চলবে না। থেমে আমরা নেইও। গত দু দশক ধরে বোম্বাই-এ চলেছে গাছ লাগাবার প্রতিযোগিতা। ফলে পূর্ব বোম্বাইয়ের ঘাটকোপার, বিদ্যাবিহার, ভিকরোলি, ভাণ্ডুপ, মুলান্ত ও পশ্চিম বোম্বাইয়েব বান্দ্রা, খার, পারলে, আন্ধেরী, মালাড, গোরেগাঁও, বরিভলি আজ সবুজতর হয়ে উঠছে। জাম আর আলামণ্ডে ভরে গেছে চার্চগেট, মাডাম কামা রোড, মেরিন ড্রাইভ। আকাশিয়া আর রেনট্রির উপবন গড়ে উঠেছে চৌপটিতে। সে তুলনায় বৃক্ষ রোপণের কাজ সম্প্রতি কিছু কিছু এগোলেও বেশ পেছিয়েই আছে কোলকাতা।

কোলকাতার বায়ুদূষণের আর একটি মূল কারণ কোলকাতার বিখ্যাত জ্যাম-জট। এই জ্যামের দরুন প্রতিটি বাস-ট্রাক-মিনি-ট্যাক্সি-প্রাইভেট গাড়ীতে অতিরিক্ত ৩০ শতাংশ জ্বালানী পোড়ে যার ফলে প্রতি বছর বায়ু দূষণ বেড়ে যাচ্ছে প্রায় ১০ শতাংশ হারে এবং এই হারে বর্ধমান বায়ু দূষণ প্রতিটি শহরবাসীর জীবনীশক্তি প্রতি বছরে কমিয়ে দিচ্ছে তিনদিন করে।[৮] ট্রাফিক জামের সময় যাত্রীরা বদ্ধ অবস্থায় আটকে থাকায় ঘামের সাথে দেহ থেকে নুন বেরিয়ে যাচ্ছে মাত্রাতিরিক্তভাবে। যাত্রী-ঠাসা গাড়ীর মধ্যে দূষিত বায়ু গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। বায়ু দূষণ নিবারণের অধিকর্তা ডঃ সুনীল ব্যানার্জীর একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ব্রাবোর্ন রোডে রাত আটটা নাগাদ ঘণ্টায় ২৫০০ গাড়ী যাতায়াত করে। ব্রাবোর্ন রোডের মত মাঝারী চওড়া রাস্তায় যদি মিনিটে ৪২টি গাড়ী রাস্তা অতিক্রম করতে চায় তাহলে জ্যাম হবেই। এরফলে বাতাসে সীসা ও সালফারের পরিমাণ বাড়ছে এমন হারে যে রাস্তাটি ধোঁয়ার চাদরে আবৃত হয়ে পড়ছে। এই বায়ু দূষণের ৩০% প্রাকৃতিক নিয়মে প্রশমিত হচ্ছে। থেকে যাচ্ছে বাকি ৭০%। পার্ক স্ট্রীটের অবস্থাও প্রায় একই রকম। থেকে যাওয়া দূষিত বায়ুর ভাগ ৬০%। এই হারে কার্বন মনোক্সাইড বৃদ্ধির পরিণাম রক্তের লোহিত কণার অবধারিত মৃত্যু। ফল অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগের আধিক্য। সীসার পরিমাণ বৃদ্ধিতে বাড়ছে মাড়ির রোগ, অস্থি-বন্ধনীর বেদনা ও স্পণ্ডিলোসিস। সালফার থেকে আসছে হাঁপানী, স্নায়ু বৈকল্য, খিটখিটে মেজাজ। ধূলিকণা থেকে হৃদরোগ। হাইড্রোকার্বন থেকে ক্যান্সার ও অ্যাজমা। জ্যামের সময়সীমা বাড়ার সাথে সাথে যাত্রীসাধারণের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ব্রাবর্ন রোডের মত তিলজলাতেও বাতাসে সীসার পরিমাণ অত্যধিক বেশী। কার্বন মনোক্সাইড বেশী পাওয়া যাচ্ছে মেটিয়াবুরুজ, খিদিরপুর, সল্ট লেক, উল্টোডাঙ্গা, দমদম, বরানগর অঞ্চলে। সালফার-বিষাক্ত বাতাস ঘিরে রয়েছে আলিপুর, হেস্টিংস, চৌরঙ্গী, কাঁকুড়গাছি, বেলেঘাটা, ট্যাংরা, মাণিকতলা, হাতিবাগান অঞ্চল। ধূলিকণার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে পার্ক-সার্কাস, কালিঘাট, ভবানীপুর, গার্ডেন রীচ, সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে। ট্র্যাফিক জ্যামের ফলে কেবল রাষ্ট্রীয় পরিবহনের (State Transport) অতিরিক্ত ডিজেল পুড়ছে দৈনিক ১৮০০০ টাকার।

সরকারী বাসগুলিই এ ব্যাপারে অধিক দোষী। পথ অন্ধকার করে তাদের কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলতে দেখা যায় প্রায়শই। রক্ষণাবেক্ষণের অবহেলা ছাড়াও মাত্রাতিরিক্ত যাত্রীবহনও এই ধূম্রউদ্গীরণের একটা কারণ। স্বল্প ব্যয়ে ধোঁয়া বেরুনোর পাইপে একটা ছোট বায়ুশোধন যন্ত্র বসালে দূষিত গ্যাসের অনেকটাই তাতে আটকে যাবে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে কিছু গাড়ীতে এই যন্ত্র বসিয়েছেন। ইণ্ডিয়ান অয়েল পেট্রলের পরিবর্ত জ্বালানী হিসাবে তরলায়িত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা এল. পি. জি.-তে গাড়ী চালানোর ব্যবস্থা করছেন, যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে রাশিয়ায়। এতে ৪০% পেট্রল বাঁচবে। ১৫ কেজি এল. পি. জি. সিলিণ্ডারে ১৫৬ কিলোমিটারের মত গাড়ী চলবে। ইঞ্জিনের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কমবে অনেকটা এবং সবচেয়ে বড় কথা পরিবেশ দূষণ হবে নামমাত্র। কলিকাতা পুলিস কান ফাটানো হর্ন ও ধোঁয়া ছড়ানো ইঞ্জিনের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন। আমাদের অধিকাংশ সৎ প্রচেষ্টার মত এটিও রাজনৈতিক চাপে বন্ধ না হলে নাগরিকদের উপকার হবে। বৈদ্যুতিক ব্যাটারী-চালিত গাড়ীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে কিন্তু ৬০/৭০ মাইল চালাবার পর ব্যাটারী আবার চার্জ করতে হচ্ছে বলে ব্যবহারিক অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। ব্রিটেনের ফাইবার গ্লাস বিশেষজ্ঞ জর্জ বেল বলেছেন ভারতীয় গাড়ীগুলি হালকা ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরী করলে কম ওজনের দরুন তেল খরচও হবে অনেক কম। ফলে বায়ুদূষণও কমবে। পলিথিনের মত ফাইবার গ্লাস নিজেও দূষণক নয়। কিছু কিছু জীপ জাতীয় গাড়ীতে ফাইবার গ্লাস ব্যবহারের ফল উৎসাহজনক। হিন্দ মোটর এ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারেন। জ্যাম জট ও বায়ুদূষণ সমস্যাটির সঙ্গে কোলকাতার পার্কিং সমস্যাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রাস্তার পাশ থেকে পার্কিং ব্যবস্থা পুরোপুরি তুলে দিতে না পারলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। কোলকাতায় গাড়ী রাখার ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক মাস্টার প্ল্যান হওয়া দরকার। নাগরিক জমির সর্বোচ্চ সীমা আইনে সরকারের হাতে প্রচুর খালি জমি এসেছে যার মধ্যে নির্বাচিত প্লটগুলিতে পার্কিং চালু করা সম্ভব। পার্ক ও পৌরসভার অধীন খালি জমিতে ধীরে ধীরে ভূগর্ভ পার্কিংও গড়ে তোলা সম্ভব, যেমন—ভূগর্ভ পার্কিং আজকাল বহুতল বাড়ীর নিচে আবশ্যিকভাবে করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যানবাহন কোলকাতার বায়ুদূষণের জন্য নিশ্চয়ই দোষী তবে আংশিকভাবে মাত্র। এরজন্য বেশী দায়ী কিন্তু শিল্পাঞ্চলের ধূম্র উদ্গীরণকারী কল-কারখানা। আমাদের শিল্পাঞ্চল মূলতঃ হুগলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত আর লোকালয় প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে পূর্ব তীরে। শীতের দুমাস ছাড়া এ অঞ্চলে বায়ু মূলত বয় দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্বে—সমুদ্র অঞ্চল থেকে ডাঙ্গার ভিতর দিকে। এ বায়ুর গতিবেগও থাকে খুবই কম। কল-কারখানার ধোঁয়া, কালি, ঝুল, ভাসমান ধাতু ও ধূলিকণা এই হাওয়ায় ভেসে এসে আছড়ে পড়ে পূর্ব পাড়ের লোকালয়ে। সব শিল্প অবশ্য বায়ু দূষিত করে না। আমাদের উচিত যেসব শিল্প তীব্রভাবে দূষিত করে আবহমণ্ডলকে সেগুলিকে নির্বাচিত করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া পূর্ব কোলকাতার পূর্বতর অঞ্চলে (মেট্রোপলিটান বাইপাসের পূর্বদিকে) আর নতুন জনবসতিকে গড়ে তোলা উচিত টালিগঞ্জ-সোনারপুর এবং মেট্রোপলিটান বইপাসের পশ্চিম পাড়ে। এতে করে কলকারখানার মূল দূষণক গ্যাস বায়ুর গতিপথে বসতি অঞ্চল থেকে আপনি সরে যাবে।[৯]

পরিবর্ত জ্বালানী নিয়েও চলছে নানান গবেষণা। বায়ো-গ্যাসের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিমবাংলায়। এতে যে শুধু আবহ পরিবেশে দূষণ কমবে তাই নয়; পাশাপাশি পাওয়া জৈব সার রাসায়নিক সারের সাথে ভারসাম্য সৃষ্টি করে ভূমি সংরক্ষণেও সহায়তা করবে। দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র উপকূলে হাওয়া-কল (Wind Mill) এবং সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় সৌর শক্তির সম্ভাবনা প্রচুর। যেহেতু আমাদের কয়লার সঞ্চয় প্রচুর, কয়লাকে অবহেলা করা চলবে না। প্রকৃতপক্ষে তৈল সংকটের ফলে আমাদের কয়লার উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গেছে। কয়লা পোড়ালে গন্ধক ও নাইট্রোজেন সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনাস অক্সাইডে পরিণত হয়। দুটি পদার্থই বিষাক্ত দূষণক। এছাড়া সূক্ষ্ম ছাই-ঝুলও ধূলিকণার রূপে বাতাসে ভেসে ওঠে। মোট ছাইয়ের ৮০% এইভাবে উড়ে যেতে পারে যাকে আমরা বলি ফ্লাই অ্যাশ বা উড়ন্ত ছাই।[১০] এর ভিতর ক্যাডমিয়াম, সীসে, পারদ, সিলেনিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক জাতীয় বিষাক্ত ধাতুকণাও মিশ্রিত থাকে। ফ্লাই অ্যাশকে সঠিকভাবে রক্ষা করে ব্যবহার করলে বায়ুদূষণ তো কমবেই, এই শিল্প-আবর্জনা থেকে বহুভাবে উপকৃত হব আমরা। যেমন:

ক. জলের উপস্থিতিতে ফ্লাই অ্যাশে চুণ মেশালে যে মিশ্রণ পাব তা সিমেন্টের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।

খ. ফ্লাই অ্যাশ থেকে হয়ত নিষ্কাশিত হতে পারে অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু।

গ. প্লাস্টিক শিল্পে ফিলার হিসাবে ব্যবহার হয় ফ্লাই অ্যাশ।

ঘ. নাইট্রোজেন ও ফসফরাস যৌগ ফ্লাই অ্যাসের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে ভূমি সংরক্ষক হিসাবে অম্লাত্মক বা ক্ষার জমিতে দিলে সে জমি কৃষি উপযোগী হয়ে ওঠে।

ঙ. নিচু জমি ভরাটের কাজে লাগানো যায় ফ্লাই অ্যাশ।

এইভাবে নতুন জ্বালানীর চলন ও পুরানো জ্বালানীর সঠিক ব্যবহার পদ্ধতির মারফত বায়ুদূষণ কমানো যেতে পারে।

শেষ করার আগে আমাদের আর একদফা সব সমস্যার মূলে ফিরে যেতে হবে। স্থল বলুন, জল বলুন বা বায়ুই বলুন—সব পরিবেশদূষণ সমস্যার মূল ক্ষার, অম্ল, ধোঁয়া, বিষাক্ত ধাতু বা কানফাটানো শব্দ—কোনোটাই নয়। মূল হচ্ছে জনবিস্ফোরণ বা উল্কার গতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এ সমস্যাকে যদি না আয়ত্ত্ব করা যায় তাহলে শুধু পরিবেশদূষণ নয়, আবাসন, খাদ্য, বেকারত্ব প্রভৃতি জীবনধারণের মৌলিক কোন সমস্যারই সমাধান হবে না। যা কিছু সৃজন করবেন, যা কিছু অর্জন করবেন সবই ভেসে যাবে পিলপিল করে বেড়ে-ওঠা মানুষের বিপুল স্রোতে। অবশ্যই বিশ্বজুড়ে চলছে সে চেষ্টা। আশার আলোও দেখা যাচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে। মার্কিন কংগ্রেসের রিপোর্টে বলা হয়েছে আগামী বিশ বছরে বিশ্ব জনসংখ্যা অন্তত: ৬৫ কোটি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। আজ পৃথিবীতে নির্বীজ মানুষের সংখ্যা ১০ কোটির বেশী যা ১৯৭০-এ ছিল মাত্র ২ কোটি। জনসংখ্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি অ্যানড্রেস ক্লিংগার বলেছেন একমাত্র ভারতেই নির্বীজকরণ পদ্ধতির সাহায্যে ৪৮ লক্ষ নতুন শিশুর জন্মরোধ সম্ভব হয়েছে। এটা একটা গর্ব করার মত কৃতিত্ব। মার্কিন সেনসাস ব্যুরো জানিয়েছেন ৭০ দশকে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমেছে। এজন্য সবচেয়ে বেশী সাধুবাদ প্রাপ্য চীনের। অর্থাৎ ৭০ দশকে চীন আমাদের টেক্কা দিয়েছে। এবার শিরোপা পেতে হলে আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে জাতীয়, রাজ্য, জেলা, ব্লক ও

গ্রামপঞ্চায়েত—এই পাঁচটি প্রশাসনিক স্তরেই—সরকারী ও বেসরকারী উভয় মহলেই।

তবুও মানি না হার।
ক্ষীণ এক আশা নিয়ে
জনাকীর্ণ এ শহরে গলি ঘুঁজি খুঁজি।
প্রান্তরের সে শরৎ—
কোন প্রাণে জেগে আছে বুঝি।
তাহলে এ সঙ্কীর্ণ শহর
আবার পেতেও পারে
হৃদয়ের শুভ্র পরিসর।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

শেষ নেই এ খোঁজার জলে স্থলে অন্তরীক্ষে!

---

১. সলিল লাহিড়ী, ২. ডঃ ভি. পি. কুড়েসিয়া, ৩. ও ৪. সলিল লাহিড়ী, ৫. আই. আই. এইচ. এণ্ড পি. এইচ, ৬. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ, ৭. আজকাল পত্রিকা, ৮. ডঃ তারকমোহন দাস, ৯. ডঃ আর. এল. মুনিচক্রবর্তী, ১০. ফ্লেকার-নায়েক-শর্মা, জে. এন. ইউ।

প্রাচীন রীতিটার কথা শুনেছিলাম কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। ওঁদের পৈত্রিক গ্রামের রীতি—পূর্ব বাংলার প্রাচীন অবলুপ্ত গ্রামীণ রীতি ও বলা যায়; ওই অঞ্চলে নির্দিষ্ট কোন শ্মশান ছিল না। কেউ মারা গেলে তাকে গ্রামের বাইরে আশে-পাশের কোন নদীর ধারে নিয়ে আসা হত দাহ করার জন্য। এর পর আশপাশের কোন গাছের ডালপালা কেটে যোগাড় করা হত জ্বালানীর। সেই কাঠ দিয়ে চিতা সাজিয়ে শবদেহে মুখাগ্নি করতেন মৃত মানুষটির পুত্র। জ্বালানী কাঠ ও মৃত দেহ পুড়ে ছাই হত। ফসফরাস ও

জৈব নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ ছাই দাহ স্থানকে করে তুলত উর্বর। দাহ কার্য শেষ হলে ছাইয়ের স্তূপকে ঘড়া করে নদী থেকে জল এনে ধোয়া হত অর্থাৎ সরসতর করে ওই দেহাবশেষ আরো ভাল ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হত মাটির সাথে। এইবার মৃতের পুত্র ওই স্থানে একটি চারাগাছ পুঁতে কামনা করতেন যে তাঁর সন্তানেরা যেদিন তাঁকে দাহ করতে নিয়ে আসবে সেদিন এই বৃক্ষই যেন জ্বালানী যোগায়। পোড়ানো গাছের বদলে সমৃদ্ধতর পোড়া মাটিতে গাছ পুঁতে দেহাবশেষের সুব্যবহার ও পরিবেশ-সংরক্ষণের চমৎকার কিন্তু বিলুপ্ত রীতি এটি।

দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগমন হয়েছে অতি বিপুল ভাবে। এর ফলে বিপুল পরিমাণে ক্ষতিকর রাসায়নিক ও অন্যান্য দূষণক পদার্থ মিশছে ভারতের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমে। সারা দেশের নগরগুলিতো বটেই, গ্রামাঞ্চল ধুঁকছে দূষিত বায়ু, জল ও জমির দাপটে। ৮৩-৮৪ সালের মধ্যে রাসায়নিক সারশিল্প বেড়ে গেছে বারোগুণ, তৈল শোধনাগারের সংখ্যা বাড়ছে ২ থেকে ৪ গুণ, কয়লার ব্যবহার ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন আগামী একযুগে চারগুণ বেড়ে যাবে। এই তালিকা থেকে পাঠক সহজেই বুঝবেন কি ভয়াবহ পরিমাণ দূষণক মিশতে চলেছে আমাদের আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে! এই ভয়াবহ শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে আমাদের হতে হবে ঠাণ্ডা মাথা, সুকৌশলী, দৃঢ়-সংকল্প। এগোতে হবে সুপরিকল্পিত উপায়ে, সমবেত প্রচেষ্টায়।

পশ্চিমবাংলা ভারতের অন্যতম শিল্পোন্নত রাজ্য। তার উপর রয়েছে প্রবল জনসংখ্যা, দরিদ্র ও বেকারীর চাপ। ফলে আমাদের পরিবেশ সারা ভারতের তুলনায় অনেক বেশী দুষ্ট, অস্বাস্থ্যকর। কোলকাতার বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ ৩৫ পি. পি. এম.-এ পৌঁছায়। এটি বায়ুদূষণের সর্বভারতীয় রেকর্ড। কাগজ, প্লাইউড, কাপড়, চিনি, লোহা, চামড়া, মদ, সার প্রভৃতি তীরবর্তী শিল্প ও কয়লা ধোতাগার আমাদের হুগলী ও দামোদরকে ভারতের দূষিততম নদীতে পরিণত করেছে। দামোদরের দূষণক হচ্ছে ফ্লাই অ্যাশ, সারশিল্পের আবর্জনা এবং ধোতাগার ও তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লার গুঁড়ো। প্রতিদিন দামোদরের বুকে ঢালা হচ্ছে ১,৫৯,১০০ ঘনমিটার শিল্প আবর্জনা যা জল থেকে শুষে নিচ্ছে ৪৩,০০০ কেজি অক্সিজেন[১]। দামোদরের মৎস্যহীনতার এটিই কারণ। হুগলীর দূষণকের তালিকা দীর্ঘতর—কাগজ, পাল্প, কাপড়, পাট, রং, বনস্পতি, রেয়ন, সাবান, দেশলাই, লাক্ষা, পলিথিন ইত্যাদি শিল্প তো আছেই; সেই সাথে আছে কল্যাণী থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত অসংখ্য শহরের নাগরিক আবর্জনা। গত ৫ বছরে কীটনাশকে বিষাক্ত খাদ্য মৃত্যু ডেকে এনেছে ৮৮৯জন পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর। নিরির মতে কোলকাতা পৃথিবীর নোংরাতম শহর। এইসব শিল্প ও নগরের আয়তন ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। কাজেই পরিবেশ সংরক্ষণের

দায়দায়িত্বও বাড়তেই থাকবে। সংরক্ষণের প্রধান বাধা হচ্ছে অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও জনগণের ঔদাসীন্য। সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে শিল্প-গুলি তার খরচের বোঝা চাপাবে তাদের উৎপাদনের উপর। অতি-বর্ধিত দ্রব্যমূল্য আরো বৃদ্ধি পাবে, হয়ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। এই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ঔদাসীন্য ও জ্ঞানহীনতা। দারিদ্র্য ও জনসংখ্যার চাপে ম্রিয়মান পশ্চিমবঙ্গবাসী বর্তমান জীবন সমস্যা নিয়েই সদা ব্যস্ত। আগামী দিনের বিপদ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করার ফুরসৎ তার নেই-ই। অথচ সাধারণ মানুষকে এ ব্যাপারে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে পারলে অনেক কম খরচে, কম পরিশ্রমে পরিবেশকে নির্মলতর করে তোলবার সঠিক প্রযুক্তি নিয়ে হাজির রয়েছেন আমাদের একাধিক গবেষণা সংস্থা—নাগপুরের এনভায়রন্‌মেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারীং রিসার্চ ইনস্টিটিউট বা নিরি, ট্রম্বের ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল কমিটি অন এনভায়রন্‌মেন্টাল প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কো-অর্ডিনেশন, বোম্বাইয়ের সেন্ট্রাল লেবার ইনস্টিটিউট। বই, প্রদর্শনী, সভা-শোভাযাত্রা এবং রেডিয়ো-টিভি-সংবাদপত্রের মারফত এই আন্দোলন নিয়ে সোরগোল তুলতে পারলে (এবং তা মাতৃভাষায় হওয়া দরকার : আমাদের বেশীর ভাগ লেখন-পঠন, অঙ্কন-ভাষণ, অন্ততঃ এ বাবদ, হচ্ছে ইংরেজীতে যার কিছুই প্রবেশ করছে না ৮০ শতাংশ বাঙ্গালীর মগজে) তা মানুষকে কৌতূহলী ও বিজ্ঞ করে তুলতে পারবে। গবেষণা ও প্রচার দুই চালাতে হবে পাশাপাশি সমান জোরে। বিষয়টিকে ইদানীং আনা হয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকায়। এ খবর রাজ্যের নবনিযুক্ত পরিবেশ মন্ত্রী জানিয়েছেন বেঙ্গল চেম্বার অব্ কর্মাসের আলোচনা চক্রে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এম. ফিল. কোর্সও চালু হতে চলেছে। এগুলি খুবই ভাল খবর। তবে প্রচারটাকে আরো নামিয়ে গ্রামের চাষাভূষোদের মধ্যে টেনে আনতে পারলে আরো ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয়।

নিরি বা ন্যাশনাল এনভায়রন্‌মেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারীং রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোলকাতাকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে সব পরামর্শ দিয়েছেন তাতে প্রকাশ পেয়েছে যে একাধিক শিল্প তাঁদের পরিত্যক্ত ময়লা জলকে শোধন করবার ঝামেলায় না গিয়ে নদীর পরিষ্কার জল মিশিয়ে পাতলা করে দিচ্ছেন যাতে আপাতঃ নজরে দূষণকের হার প্রতি ঘন মিটারে খুবই

কম দেখায়। এবং এই পাতলা আবর্জনাময় দূষিত জলকে নির্বিবাদে চালান করে দিচ্ছেন গঙ্গার বুকে। **জল (সংরক্ষণ ও দূষণ দমন) আইন, ১৯৭৪**-কে ফাঁকি দিতে এভাবে 'দূষিত' জলে 'নির্মল' ভেজাল মেশানো যতই কৌতুকাবহ মনে হোক না কেন, আসলে ব্যাপারটা নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। এ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আরো দুটি আইন রয়েছে: (১) **জলকর আইন, ১৯৭৮** এবং **বায়ু (সংরক্ষণ ও দূষণ দমন) আইন, ১৯৮১**। এই আইনগুলিকে সরকার এখন ও খুব একটা কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ করেন নি। করা দরকার যাতে শিল্পপতিরা পরিত্যক্ত নোংরা বিষাক্ত জল ও গ্যাস যেন-তেন-ভাবে কারখানার বাইরে বার করে দিতে ভয় পান। এই সব আইনে দোষী শিল্পপতিদের জেল, জরিমানা—দু রকম দণ্ডেরই ব্যবস্থা রয়েছে। নিরির মতে, যে কোন শিল্পে পরিত্যক্ত জল দুটির বেশী পথে কারখানার বাইরে যেতে দেওয়া উচিত নয় এবং এই দুই প্রবাহমুখেই দূষণের পরিমাপ করার যন্ত্রপাতি বসানো থাকা দরকার। স্নানের ঘাটগুলির তিন কিলোমিটার উজানে ও নিচে পর্যন্ত ঘরোয়া আবর্জনাযুক্ত ময়লা জল ফেলতে হলে তা ফেলবার আগে ক্লোরিন দিয়ে শোধিত করে নিতে হবে। বায়ুদূষণ দমনে নিরির পরামর্শ:

(১) বয়লার ও অন্যান্য চুল্লী যাতে অযথা ধোঁয়া না ছাড়ে সেই ভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে ও তাতে কোক কয়লা ব্যবহার করতে হবে।

(২) বায়ু সংরক্ষণ আইনের গ্রহণ যোগ্য দূষণের মাত্রাগুলি কমাতে হবে ও আইনটি আবশ্যিক ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) শিল্পের শোধন যন্ত্রগুলি যথাযথ ভাবে কাজ করছে কিনা সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। ঘরোয়া চুল্লীতেও ব্যবহার করতে হবে এল. পি. জি. গ্যাস বা তার অভাবে নরম কোক কয়লা। গাড়ীর ইঞ্জিনগুলিকে ঠিক ভাবে টিউনিং করে ধূম্র উদ্‌গীরণ বন্ধ করা আইনতঃ আবশ্যিক করতে হবে। উপযুক্ত যাতায়াত পরিকল্পনা ও যথাযোগ্য ফ্লাইওভার, ওয়ান ওয়ে, পার্কিং লট, রাউণ্ড অ্যাবাউট ও বুলেভার্ড তৈরী করে জ্যাম-জট কমাতেই হবে। স্টেশন সংলগ্ন ইয়ার্ডে বগি ও ওয়াগন আনা-নেওয়ার জন্য স্টীম ইঞ্জিনের বদলে ইলেকট্রিক বা ডিজেল ইঞ্জিন চালানো দরকার। শহরে ঘাস জমি ও গাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে যথাসম্ভব দ্রুত হারে। কান ফাটানো হর্ন ও শিল্পোদ্ভূত শব্দ নিষিদ্ধ করে দিতে হবে শহরাঞ্চলে। রবার্ট কোচ বলেছিলেন

'একদিন আসবে যখন কলেরার মত শব্দও মহামারী রূপে দেখা দেবে।' সে দিন এসে গেছে। বর্তমান হারে শব্দ বেড়ে চল্লে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার মানুষ হবে পরিপূর্ণ ভাবে বধির২।

জলদূষণ রোধে জলদূষণ রোধ ও নিয়ন্ত্রণ বোর্ড উপরের কার্যক্রম সমর্থন করে বলেছেন গঙ্গার দৈর্ঘ্য বিরাট হওয়ায় এবং কিছু নিজস্ব প্রাকৃতিক শোধন ব্যবস্থা থাকায় বহু স্থানে গঙ্গার জল আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বচ্ছ দেখায়। কিন্তু বর্তমানে গঙ্গার নিজস্ব প্রাকৃতিক ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে রাজ্যের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয় পাটনা থেকে হলদিয়া পর্যন্ত গঙ্গাকে দূষণ-মুক্ত করার ও গাঙ্গেয় সম্পদের পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করার জন্য যোজনা কমিশন-প্রস্তাবিত এক প্রকল্প রূপায়ণের কাজে হাত দিচ্ছেন। এই সঙ্গে আর একটি চিন্তা খুবই প্রয়োজনীয়। তা হল কোলকাতা বন্দরের উন্নতি সাধন। দেশের বন্দর প্রসারণের সামগ্রিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৪০ কোটি টাকা যার মধ্যে এক পয়সাও বরাদ্দ হয় নি কোলকাতার খাতে। কোলকাতা দেশের ১০টি বড় বন্দরের অন্যতম। দেশের বৃহত্তম হিন্টারল্যাণ্ডের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ কোলকাতা বন্দরের মারফত। ৭৯-৮০ সালে আমদানী-রপ্তানীর মোট পরিমাণ ৭৮·৫৭ মিলিয়ন টন—যার সিংহ ভাগ যাওয়া-আসা কোলকাতা বন্দর মারফৎ। এক্ষেত্রে কোলকাতার বন্দর সম্প্রসারণ ও গঙ্গার উপযুক্ত নাব্যতা সংরক্ষণ জাতীয় কর্তব্য। এই প্রয়োজনীয় নাব্যতা দূষণের হাত থেকেও অনেকাংশে রক্ষা করবে গঙ্গাজলকে। ভারতে নতুন আইন হতে চলেছে সামুদ্রিক জলদূষণ প্রতিরোধে। এই আইনে আধুনিক সরঞ্জাম সহ মনিটারিং কেন্দ্র স্থাপন করা হবে সাগর বক্ষে ভাসমান বয়ার সাহায্যে। সামুদ্রিক মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্র (C. M. F. R. I.) পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের বিভিন্ন নদী মোহনার মুখে ২০,০০০ হেক্টর জল বাঁধে আটকে মাছচাষের সূত্রপাত করছেন। এ হেন নোনা জলের পরিমাণ ২০ লক্ষ হেক্টর হতে পারে। এই মাছ চাষে শুধু সামুদ্রিক সম্পদই বাড়বে না, যে সব আবর্জনা গড়িয়ে পড়ে এখন সমুদ্রের বুকে জমা হচ্ছে তা আটকে যাবে মোহনার মুখে ও পরিণত হবে মাছের পুষ্টিকর খাদ্যে। এই গবেষণার সহায়ক শিক্ষা হিসাবে চালু হয়েছে **জল-সূত্রগত-পূর্ত বিদ্যা** (Aqua-Culture Engineering)। এঁদের প্রধান কাজ হবে সমুদ্র উপকূলের

মৎস্য খামারগুলিকে গড়ে তোলা। আমাদের উপযুক্ত জল ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। কারণ তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে পানীয় জল আমাদের কাছে পেট্রলের থেকেও মহার্ঘ হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গতঃ একটা চমকদার খবর, লায়ন্স ডিস্ট্রিক্ট ৩২২-বি সংস্থা বারাসত, কল্যাণী, চন্দ্রপুরা, পিয়ালী, মায়াপুর, চন্দ্রবেড়িয়া ও লিলুয়াতে উইণ্ড মিলের সাহায্যে পানীয় ও সেচের জল সরবরাহের প্রস্তাব করেছেন। এই প্রচেষ্টা দেশের বিভিন্ন ক্লাব, যুব সংগঠন ও সমাজসেবী সংস্থার অনুকরণযাগ্য।

ভারতে জল ও বায়ুদূষণ রোধ আইনগুলি এ পর্যন্ত ভালভাবে প্রযুক্ত হয় নি। একটি মাত্র ক্ষেত্রে কারখানার রাসায়নিক আবর্জনা দিয়ে যমুনা নদীকে বিষাক্ত করার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে এক বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে। এই সব আইন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হলে এ জাতীয় মামলা চালু করতে হবে প্রতিটি অঞ্চলে প্রতিটি দায়ী শিল্পের বিরুদ্ধে। আশীর দশককে **'আন্তর্জাতিক নির্মল জল দশক'** বলে ঘোষণা করা হয়েছে; শতকরা ১০০ ভাগ নাগরিক ও ৮০ ভাগ গ্রামীণ মানুষের কাছে সুপেয় পানীয় জল ও ৮০ ভাগ নাগরিক ও ২৫ ভাগ গ্রামীণ মানুষের জন্য শুচি ব্যবস্থা পৌঁছানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দশকের প্রথম দু বছরে (৮১-৮২) ২২০টি গ্রামীণ ও ৮৬টি নাগরিক জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ৮৪-এর শেষাশেষি চালু হয়েছে আরো ১৮৮টি গ্রামীণ ও ২৬টি নাগরিক ব্যবস্থা। শুচি ব্যবস্থায় ৭টি শহরের ভূগর্ভ নর্দমা ও ময়লা জলের শোধনাগার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গ্রামীণ শুচি ব্যবস্থার প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হবে পরবর্তী পাঁচ শালা পরিকল্পনায় (১৯৮৫-১৯৯১)।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ধূম্রোৎপাত কমিশন ও ডাইরেক্টরেটের: এঁদের ইন্‌স্পেক্টরদের দায়িত্ব বায়ু (দূষণ ও সংরক্ষণ) আইনের কোন ধারা কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা দেখা। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন অঞ্চলে ফারনেস, বয়লার, রাসায়নিক, ধাতুবিদ্যা বা যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বসাতে হলে কমিশনের অনুমতি আবশ্যিক। আইন ভাঙ্গলে জেল-জরিমানা দুইই হতে পারে। অপ্রতুল বা অপ্রচলিত দূষণ শোধন ব্যবস্থা গ্রহণও বেআইনী এবং দণ্ডনীয়। কমিশন ও ডাইরেক্টরেট প্রয়োজনে আবর্জনা অপসারণ, নির্বাচিত আবর্জনার পুনর্বিনিয়োগ, বাতাসের দূষণমাত্রা মাপা ও

শোধন ব্যবস্থা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে আসছেন বিগত ৭৭ বছর ধরে। পরিবেশ মন্ত্রক গঠিত হওয়ার ফলে এইসব পরামর্শের মূল্য ও চাহিদা বেড়ে উঠেছে এবং কমিশন ও ডাইরেক্টরেটকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। কমিশন গত ১২ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বহু শিল্পকে সস্তায় ও লাভজনক উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাৎলে দিয়েছেন। নিয়ন্ত্রণের খরচ দূষণক যন্ত্রের দামের দেড় শতাংশ মাত্র। যেসব লাভজনক উপায় পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ফারনেসের বায়ুরুদ্ধ যান্ত্রিক জ্বালানী প্রয়োগ পদ্ধতি (Sealed Type Mechanical Fuel Feed System), অম্ল, ক্ষার, কাগজ, মিশ্র ধাতু, সার ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপযুক্ত স্বল্প শক্তিসম্পন্ন অনুত্তাপ সক্রিয় সমষ্টিগত পাতন প্রক্রিয়া (Low Energy Non-heating Reaction Type Agglomerating Precipitor), অন্তর্দহন ইঞ্জিনে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রকার্বনের ৯৬ ভাগ দহন ও ৫০ ভাগ জ্বালানী সঞ্চয়ের পদ্ধতি, নাগরিক আবর্জনা থেকে পাইরোলিসিস পদ্ধতিতে জ্বালানী গ্যাস ও সিমেন্ট প্রস্তুত পদ্ধতি ইত্যাদি। এ ছাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইটভাঁটা, পেট্রল ও ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত যান-বাহন, ঘরোয়া চুল্লী প্রভৃতির স্বয়ংসম্পূর্ণ শোধন ব্যবস্থা সম্পর্কেও ডাইরেক্টরেটে প্রচুর গবেষণা হয়েছে[৩]। এই গবেষণার ফলস্বরূপ এঁরা ওয়েল্ডিং-এর হালকা বহনযোগ্য তাঁবু, মাটিকাটা বা ভরার জায়গায় বেড় দেবার জন্য লতাগাছ-সমেত হালকা বহনযোগ্য তারের জালের বেড়া, মোটরের সাইলেন্সার ও ধোঁয়া (কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বন) পোড়াবার যন্ত্র, উন্নত ধোঁয়াবিহীন ইনসিনারেটার ও ঘরোয়া উনুন আবিষ্কার করেছেন। এইসব যন্ত্রপাতির নির্মাণকৌশল ও ব্যবহারিক জ্ঞান চাইলেই পাওয়া যাবে এঁদের কাছ থেকে।

জলবায়ুর পরই অবধারিতভাবে এসে পড়ে মাটি ও এই তিনের যৌথ সন্তান—গাছগাছড়া এবং বন্যপ্রাণী। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী ও রাজকীয় সিলগুলিতে যে বিপুলভাবে গাছ-পালা, পশু-পাখীর উল্লেখ ও চিত্রাঙ্কিত হয়েছে তাতে সহজেই অনুমান করা যায় সিন্ধুসভ্যতার আমল থেকেই প্রাণী ও উদ্ভিদের সংরক্ষণ একটা বিশেষ সামাজিক প্রথা বলেই স্বীকৃত ছিল। মুনি-ঋষিদের আশ্রমে গরু, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি প্রাণী ও নানাজাতের পাখী আশ্রমবাসীদের সাথে নির্ভয়ে সহাবস্থান করত। ওইসব বনাঞ্চলে পশুহত্যা, শিকার ও গাছপালা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বাণপ্রস্থ ব্যবস্থার সাথে বনানীর ছিল অতি নিবিড় সম্পর্ক। গণেশের হাতির মাথা,

বরাহ, কূর্ম ও নৃসিংহ অবতার এবং দেবতাদের বাহন হিসাবে জন্তু-জানোয়ারের কল্পনা, পঞ্চতন্ত্রজাতীয় উপদেশমূলক কাহিনীতে পশুপাখীর অংশ গ্রহণ ইত্যাদি সবই প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সমাজে উদ্ভিদ ও জীব সংরক্ষণের অকাট্য প্রমাণ। পরিবেশদূষণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছাবার শত শত বছর আগে সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা ভারতীয় জীবন-দর্শনের এক অতি অনন্য দিক হিসাবে স্বীকার করতেই হবে। মৌর্য সাম্রাজ্যে বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চল সংরক্ষণে আইন তৈরি হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে জানা যায় মৌর্যযুগে দেশের বনাঞ্চল উপযুক্তভাবে তদারকী করার জন্য আট শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ও ঘনতম জঙ্গলগুলি ছিল হাতির আবাস হিসাবে সংরক্ষিত। অন্যান্য বনাঞ্চলগুলিতে বাঘ, সিংহ, হরিণ, গণ্ডার ও অন্যান্য পশুপাখী আশ্রয় পেত। এইসব সংরক্ষিত বনে কাঠকাটা ছিল নিষিদ্ধ এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল প্রতি জঙ্গলে একজন করে বন-উপাধ্যক্ষের হাতে। মেগাস্থিনিস-এর বিবরণে জানা যায় যে মৌর্যরাজাদের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রাণী শিকারের আইনগত অধিকার ছিল। কিন্তু সম্রাট অশোক সেই সঙ্কীর্ণ অধিকারও নিষিদ্ধ করলেন। অহিংসাকে তিনিই প্রথম ধর্মের অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করলেন। ভারতের প্রথম চিড়িয়াখানাগুলি অশোকের সৃষ্ট। খাদ্যতালিকা থেকে তিনি টিয়া, ময়না, হাঁস, শকুন, ময়ূর, সারস, বক, কাঠবিড়ালী, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতির মাংস বাদ দিয়েছিলেন ও বছরে ৭২ দিন প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। শুক্রাচার্যের তত্ত্বাবধানে গুপ্তযুগে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের আইন-গুলির আরো কড়া প্রয়োগ করা হয়। ময়ূর ও কিছু অন্য পাখী হত্যা একেবারেই নিষিদ্ধ করা হয়। সমসাময়িক শিল্প ও ভাস্কর্যে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী একটা বড় অংশ অধিকার করে ছিল।

পরবর্তী বৌদ্ধযুগেও এইসব সংরক্ষণ বজায় ছিল পুরো মাত্রায়। বন্যপ্রাণী ও বনাঞ্চলের ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় দুর্বল হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে এবং গুরুতর আকার ধারণ করে মোগলযুগে। বাবর-নামা থেকে জানা গেছে এইসময় ধনাক শ্রেণীর বিলাসিতা ছিল জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে পশু শিকার করা। সম্রাট আকবর এক হাজার চিতা বাঘ শিকার করেছিলেন। চিতা আজ এক অবলুপ্ত প্রজাতি। এই ধ্বংস লীলায় ইন্ধন যোগাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা ও তাঁদের অনুগৃহীত স্থানীয় রাজন্য সমাজ—যাঁরা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন ২০০ প্রজাতির পশুপাখি। আজ অবশ্য আবার ফিরে

এসেছে সংরক্ষণের সুদিন। নিরাপদ অভয়ারণ্যে বেড়ে উঠছে অসংখ্য প্রাণী—৪০০ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ১২০০ প্রজাতির পাখি, ৩৫০ প্রজাতির সরীসৃপ ও ২৯,৭০,০০০ প্রজাতির কীটপতঙ্গ। এর মধ্যে কৃষ্ণসার মৃগ, নীলগাই, সিংহপুচ্ছ ম্যাকাও, স্বর্ণময়ূর, চিত্রল হরিণ, কস্তুরী মৃগ, সাম্বার, স্বর্ণ মার্জার, হাতি, রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ভারতীয় সিংহ, এক-শৃঙ্গী গণ্ডার, বাইসন, চিতা, পেলিকান, বাস্টার্ড পাখি, সাদা বাঘ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত। বাঘের সংরক্ষণ প্রকল্প 'প্রোজেক্ট টাইগারের' দরুন ৮টি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে তাদের সংখ্যা ১৯৭২-৭৩ এ ছিল ৩০০। এইভাবে সুন্দরবনে কুমীর প্রকল্পও চালু হয়েছিল কুমীর সংরক্ষণার্থে। আজ শাখাপ্রকল্প ছড়িয়ে পড়েছে অন্ধ্র, বিহার, গুজরাট, কেরলা, উড়িষ্যা, তামিলনাডু ও উত্তর প্রদেশে। ভারতে আজ অভয়ারণ্যের সংখ্যা ২২, যার মধ্যে মাত্র ১টি (এবং ক্ষুদ্রতমটি) উত্তর বাংলার জলদাপাড়ায় অবস্থিত (৬৫ বর্গ কিলোমিটার ঘেসো জঙ্গল)। এক-শৃঙ্গী গণ্ডার ও বাইসনের জন্য খ্যাত। নিম্ন বাংলায় এক-আধটি পাখিরালয় থাকলেও কোন স্বীকৃত অভয়ারণ্য নেই[৪]। সুন্দরবনে আশু একটি জাতীয় পার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের বনভূমি বৃদ্ধির বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতী জমিতে বনপ্রসারণ চালু হয়েছে (১২ ও ১৩নং চিত্র)।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাগরিক দৃশ্যপটটি ভিন্নতর। কিছু চারা পোঁতা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তার বেশির ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। উন্নয়ন আধিকারিকগুলি উন্নয়নের নামে ক্রমে গ্রাস করেছেন পৌর উদ্যান ও পার্কগুলি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে এক চতুর্থাংশ জুড়ে গড়ে ওঠা সি. এম. ডি. এ.র দ্বিতল অফিস ভবনটি। অথচ কোলকাতার শুরুটা ছিল জঙ্গলময়। রেভারেণ্ড লং-এর দেয়া বিবরণ থেকে জানা যায় সুন্দরবন একদা ছিল কালিঘাট ছাড়িয়ে সুতানটি গোবিন্দপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোলকাতা ছিল গোলপাতার জঙ্গলে ভরা। আর ছিল সুন্দরী, গেঁও, বাইন, কেওড়া, গরান, কুল, বেল, নিম, পিটুলী, হিজল প্রভৃতি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উদ্যোগে গঠিত লটারী কমিটি স্থাপন করলেন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ও ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। এঁরা গড়ে তুললেন পথ, ঘাট, পার্ক, দীঘি। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় সরকারী পথ ছিল চারটি। ১৭৭০ নাগাদ বেড়ে হল

দেড়শ। আঠারো শতকের শেষাশেষি মারাঠা ডিচ বুজিয়ে তৈরী হল সার্কুলার রোড। রাস্তার ধারে, মাঠে ময়দানে শুরু হল দেশী-বিদেশী বৃক্ষরোপণ পর্ব। তৎকালীন কোলকাতার ৯৫টি প্রজাতির গাছের ৩০টি বিদেশী ও ২৪টি ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানীকৃত। চৌরঙ্গী রোডের ধার ঘেঁষে ছিল তিন সারি বিদেশী গাছ। টালাপার্ক ও পদ্মপুকুর ছেয়ে ছিল শিরীষ গাছ। ডালহাউসী স্কোয়ারের পূব-পশ্চিম জুড়ে রাজত্ব করত অশোক আর পলাশ। পার্কসার্কাস ময়দানে ছিল সজনের উপবন। ১৯১২-১৩ সালে চওড়া করা হয়েছিল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু। দুপাশে সার সার লাগানো হয়েছিল জারুল যা আজ অদৃশ্য। তেমনি আলিপুর ও বেলভেডিয়ার অঞ্চলের মেহগনির দলও আর নেই। ক্যাসুরিনা অ্যাভিন্যুর ক্যাসুরিনা শুধু নামেই হাজির। কোলকাতার নিজস্ব হিজল, গরান, সুন্দরী, বাইনের দলও অবলুপ্তপ্রায়। বৃক্ষরোপণের একটা উৎসাহ ও আগ্রহ কোলকাতার নাগরিকদের মধ্যে রয়েছে বিগত দুশো বছর ধরে। বছর বছর পোঁতাও হচ্ছে শত শত চারা—সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী, বনবিভাগ, পৌর প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংঘ ইত্যাদির মারফৎ। কিন্তু এইসব চারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বিশেষ কোন সুপরিকল্পিত চেষ্টা বা পদ্ধতি চোখে পড়ে না। ফলে এইসব চারা শৈশব পেরুবার আগেই হয়ে যায় জালানী বা গরু-বাছুরের খাদ্য।

কোলকাতার জগদ্বিখ্যাত চোখজ্বালানো ধোঁয়াশা, জমাটি জ্যাম আর রকমারী শব্দকল্পদ্রুমের সাথে তাল রেখে ক্রমাগত আমাদের বুকে চেপে বসছে এক নতুন দূষণক—**দুর্গন্ধ**। দুর্গন্ধ দু'জাতের—আবর্জনা-জাত এবং শিল্প পদ্ধতি-জাত। দু ধরনের দুর্গন্ধই মানুষের দেহ-মনের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর। দুর্গন্ধ মাত্রাতিরিক্ত হলে তা থেকে ক্ষুধাহীনতা, বিমর্ষতা, মানসিক অবসাদ, হাঁপানী, পেটের অসুখ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে[৫]।

শিল্পগত দুর্গন্ধ আসে মদ ও বীয়ার প্রণালীর মাধ্যমে (উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আসানসোলের ক্যোরু কোম্পানীর ডিস্টিলারী, ডায়মণ্ডহারবার রোডে জোকাস্থ ডিস্টিলারীর কথা); অথবা চামড়ার ট্যানিং পদ্ধতি মারফৎ (পূর্ব কোলকাতার ট্যানারীগুলি ট্যাংরা অঞ্চলকে প্রায় গন্ধপুরীতে পরিণত করেছে)। এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প, যথা—পলিমার শিল্প, অ্যামোনিয়া শিল্পও দূর্গন্ধ সৃষ্টির জন্য দায়ী। এইসব দুর্গন্ধকে চাপা দেওয়া ব্যয়বহুল।

ফলে আইনের কড়াকড়ি না করলে শিল্পপতিরা সেধরনের ব্যবস্থা নিতে মোটেই আগ্রহী হবেন না।

কিন্তু স্বল্প খরচে যেসব দুর্গন্ধকে সহজেই ঢেকে দেওয়া যায় অথচ আমাদের নাগরিক কর্তৃপক্ষের অবহেলার দরুন শহরে শহরে তা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে ভয়াবহ দূষণের বীজ তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে আবর্জনা-পরিবহন-ব্যবস্থাজাত গন্ধ। খাটা পাইখানা, খোলা নর্দমা, চাকনাবিহীন ডাস্টবিন ও উন্মুক্ত পরিবাহক লরি ও ওয়াগনই এধরনের দুর্গন্ধের মূল। স্যানিটারী পাইখানা (এ ব্যাপারে সি. এম. ডি. এ.র প্রিকাস্ট পাইখানা বসানোর প্রচেষ্টা এক প্রসংশনীয় উল্লেখের দাবী রাখে। বৃহত্তর কোলকাতায় ব্যক্তিগত মালিকানায় যেসব খাটাপাইখানা রয়েছে তার মালিক এক-চতুর্থাংশ ব্যয়বহন করলে বাকি তিন ভাগ ব্যয় অর্থাৎ প্রায় ১৬০০ টাকা খরচ করে সি. এম. ডি. এ. খাটা পাইখানার পরিবর্ত হিসাবে এই প্রিকাস্ট স্যানিটারী পাইখানা বসিয়ে দেন নিজস্ব তত্ত্বাবধানে। এছাড়া স্কুল, বস্তি বা সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে এধরনের পাইখানা বসানোর পুরো খরচই সি. এম. ডি. এ. বহন করেন। অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ-দমনে সি. এম. ডি. এ.র এই উদ্যোগের ফলাফল নিঃসন্দেহে হবে সুদূরপ্রসারী।) এবং সাবেকী ঢাকনা-ওয়ালা ডাস্টবিন, নর্দমা ও বন্ধ লরির প্রবর্তন করলে সহজেই আবর্জনা-পরিবহনজাত দুর্গন্ধকে দমন করা সম্ভব। আসলে এখানে খরচের প্রশ্নটা বড় নয়—বড়, কর্তৃপক্ষের সচেতনতার প্রশ্ন।

এছাড়াও বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জেই পাওয়া যায় পাঁচ গন্ধ-উৎপাদক :

১. বাজার—পচনশীল (Perishable) দ্রব্যের বাজারে পচা আনাজ, সবজির খোসা, মাছ ও মাংসের চামড়া, আঁশ, নাড়ীভুড়ির দুর্গন্ধ এক অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। গোটা কয়েক ঢাকা ডাস্টবিন ও কিছু ব্লিচিং পাউডার কিন্তু অনায়াসে দমন করে ফেলতে পারে এই দুঃসহ গন্ধ।

২. কিছু কিছু দোকানপাটও দুর্গন্ধ ছড়ানোর ব্যাপারে দায়ী, যেমন—টায়ার মেরামতের দোকান (রবার পোড়া গন্ধ), পেট্রল পাম্প ও গাড়ী মেরামতি কারখানা (কাঁচা পেট্রল, ডিজেল ও অ্যাসিডের গন্ধ), দেশী মদের ভাঁটিখানা ইত্যাদি।

৩. খাটাল, মুরগী খামার ও শুয়োরের খোঁয়াড়। এগুলি যাতে

শহরের ভিতর গড়ে উঠতে না পারে, সেদিকে নাগরিকদের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।

৪. এঁদো পচা পুকুর এবং স্থির জলের খানা, ডোবা, নর্দমা। জল বহমান না হলে এবং তার আয়তন যদি অল্প হয় অর্থাৎ ছোট বদ্ধ জল পচে দুর্গন্ধ ছড়াতে বাধ্য। এর উপর যদি ধূলো-বালি মিশে পচা কাদার সৃষ্টি হয় তা হলে তো কথাই নেই।

৫. ফুটপাথে ভিখিরীদের আড্ডা এবং বস্তিবাড়ীর নোংরা পরিবেশ। এই নোংরা পরিবেশের মূল কারণ, এই সব স্থানের মালিকানা সম্পর্কে আবাসিকদের নিরাসক্ত অবহেলা। মালিকানাবোধ থাকলে এঁরা পরিবেশকে এত দুর্গন্ধময় নোংরা করে রাখতেন না।

কোলকাতার বুকে চেপে বসা ধোঁয়াশার, দুর্গন্ধের জ্বালা ধরানো সমস্যা সমাধান করতে কোলকাতাকে সবুজতর করে তোলাই বোধহয় একমাত্র উপায়। হিমাচল প্রদেশে সর্বোদয় কর্মী শ্রীসুন্দরলাল বহুগুণা বৃক্ষ সংরক্ষণে নতুন করে চালু করেছেন **'চিপকো'** আন্দোলন[৬]। কোলকাতাতেও তো রয়েছেন বহু সর্বোদয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ। আমরাও কি পারি না এক চিপকো আন্দোলনের মাধ্যমে ধূলিহীন, সুগন্ধে ভরা ঠাণ্ডা এক ঘনশ্যামল সরস কোলকাতা, এক রূপসী বাংলা গড়ে তুলতে?

ক্ষীণধারা সেই সুর তবু আর থেমেও থামে না।
সেই সুরে উদ্দীপিত
সংশপ্তক নারায়নী সেনা
হাসি মুখে সব মৃত্যু হয়ে যায় পার।
অন্ধকার বন্দীপুর ভেঙ্গে খোলে জ্যোতির দুয়ার।

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

সেই সুরে সংরক্ষণের গান গাইতে হবে আমাদের।

---

১. অনুপম হালদার, ২. ডঃ তারকমোহন দাস, ৩. ডঃ এস. সি. ব্যানার্জি, স্মোক নুইসেন্স ডাইরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ, ৪. কোটপাল ও বালি, ৫. অনুপম হালদার, ৬. রিচার্ড বার্কার।

আকর গ্রন্থের তালিকা

ইংরাজি বই :

(1) Water Pollution—V. P. Kudesia : Progati Prakashan.

(2) Approved Practices in Soil Conservation—Albert B. Foster : Oxford & IBH Publishing Co.

(3) Concepts of Ecology (Environmental Biology & Field Biology)—R.L. Kotpal & N.P. Bali : Vishal Publications.

(4) Nature's Network—Keith Reid : Aldus Books Ltd.

(5) Man's Impact on Nature—J.A. Lauwerys : Aldus Books Ltd.

(6) Conservation—Joyce Joffe : Aldus Books Ltd.

(7) Geography of West Bengal—S.C. Bose : N.B.T.

(8) Book of Comparisons—Diagram Group : Penguin Books.

(9) Pollution Rules over Calcutta—Anupam Halder : Omniprint.

বাংলা বই :

(১) বিজ্ঞানের ইতিহাস—সমরেন্দ্র সেন : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব্ সায়েন্স

(২) শক্তি : বিভিন্ন উৎস—অমিতাভ রায় : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(৩) গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি—দুর্গা বসু : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

(৪) পদার্থ বিকিরণ বিশ্ব—সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং

(৫) অদৃশ্য জগৎ—সমরেন্দ্র সেন : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং

(৬) পরিবেশ ভাবনা—সলিল লাহিড়ী : মডেল পাবলিশিং হাউস

(৭) ভারতের খনিজ—রাজশেখর বসু : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
(৮) রসায়নের ব্যবহার—ডঃ শর্বাণীশঙ্কর সরকার : ঐ
(৯) উদ্ভিদ জীবন—গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
(১০) কয়লা—শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
(১১) সুখাসনে সুখাহার—ডঃ রমেন মজুমদার : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং
(১২) পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য—ডঃ তারকমোহন দাস : জোনাকি

<u>সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র :</u>

(১) The Statesman
(২) আজকাল : The Aajkaal Publishers Pvt. Ltd.
(৩) ধনধান্যে : প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
(৪) জ্ঞান বিজ্ঞান : বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
(৫) Design : Builders Publications of India Pvt. Ltd.
(৬) Which ? : Indian Inst. of Consumer Affairs
(৭) Science Reporter : C. S. I. R.
(৮) বিজ্ঞান জগৎ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(৯) মহানগর : শুভম

’৭১ অরোভিলের ভারত নিবাস ডিজাইন প্রতিযোগিতায় মাদারের আশীর্বাদ লাভ করে তাঁর পরিকল্পনা। ওই বছরই ভারতীয় স্থপতি সংস্থা তাঁকে ফেলো রূপে নির্বাচিত করেন। ১৯৭৪-এ অ্যাসোসিয়েট রূপে নির্বাচিত করেন ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইণ্টিরিওর ডিজাইনারস। ১৯৭৮-এ কোলকাতা হাইকোর্ট তাঁকে ভ্যালুয়ার হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৭৯-এ ভারত সরকার তাঁকে স্থাবর সম্পত্তির মূল্যায়ক রূপে রেজিস্ট্রেশন দেন।

শিক্ষাজগতের সংগে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। ’৭১ থেকে খড়্গপুর আই. আই. টি.-র ভিজিটিং লেকচারার। সম্প্রতি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিযুক্ত করেছেন স্থাপত্যের পরীক্ষক হিসেবে। উইমেনস পলিটেকনিক ও স্টেট কাউন্সিল অব্ টেক্‌নিক্যাল স্টাডিজের সংগে তাঁর যোগাযোগ বহুদিনের। গৌহাটি পলিটেকনিকের পাঠ্য নির্ধারণ কমিটির তিনি ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী সদস্য।

লক্ষ্মীর সংগে সরস্বতীরও চলেছে আরাধনা। ‘অমৃত’, ‘ধনধান্যে’ ও ‘যুগান্তরে’ নিয়মিত বেরোয় তাঁর প্রবন্ধ। ছোটবেলায় লিখতেন ‘পরিচয়’ ও ‘বসুমতী’তে। অধুনা প্রকাশিত মাসিকপত্র ‘মালিনী’র বিভাগীয় পরিচালক। ‘গেরস্থালীর পাঁচালী’ বিভাগ নিয়মিত চালাচ্ছেন একেবারে গোড়া থেকেই। নীরস্ টেকনিক্যাল বিষয়কে সরস সহজ-পাঠ্য করে তোলার যে সুন্দর সাহিত্যিক-সুলভ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে তার প্রমাণ ‘পরমা-প্রকৃতি’।

প্রথমাংশের চারিটি অধ্যায়ে আমরা দেখবো জড় আর জীব কিভাবে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে যুগ-যুগান্ত ধরে রচনা করে চলেছিল এক অকৃত্রিম ভারসাম্য। তুলাদণ্ডের দুটি পাত্রে লক্ষ বছর ধরে সমানভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল প্রকৃতির দুই অঙ্গ—জড় ও জীবের।

●

দ্বিতীয়াংশের চার অধ্যায়ে পাবো সভ্যতার অগ্রগতিতে আজ কিভাবে দুষ্ট হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে সেই ভারসাম্য। মানুষ বিনাশ করছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতি প্রতিঘাত হানছে মানুষের উপর। এ অসম যুদ্ধে মানবাত্মার অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী—যদি না সন্ধি হয়। আর সেই সন্ধির শর্ত – পরিবেশ সংরক্ষণ।